চিরকালের ছড়া

চিরকালের ছড়া

সংকলন ও সম্পাদনা

সুনীল জানা

সপ্তর্ষি প্রকাশন

বাংলা ছড়া : বাঙালির ছড়া

পুজোর নৈবেদ্যের চূড়ায় সাজানো একটা সন্দেশ বা কাঁঠালিকলার মত এই প্রচলিত বাংলা ছড়া সংকলনের সুরুতেও একটা মানানসই ভূমিকা প্রয়োজন, যা আমার মত অর্বাচীন সম্পাদকের পক্ষে রচনা করা প্রায় অসাধ্য। কোনো পণ্ডিত-গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে নয়, রসাস্বাদনের আনন্দেই আমি এই ছড়া সংকলনে আগ্রহী হয়েছি। আমাদের শৈশবের সরস স্মৃতিগুলোকে এ প্রজন্মের শৈশব-হারানো শিশু-বালকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছি, যদি তারা স্বপ্নের ছেলেবেলাগুলো কোনো ভাবে ফিরে পেতে পারে এই ছড়ার রাজ্য থেকে।

প্রচলিত বাংলা ছড়া নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য সুকুমার সেন প্রমুখ মনীষীরা ইতিপূর্বেই অনেক মনোজ্ঞ ও রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে গ্রামাঞ্চলে মা-ঠাকুরমা ও গ্রাম্য মহিলাদের মুখে মুখে উচ্চারিত অজস্র ও বহু বিচিত্র ছড়ার রাশি কারণে অকারণে আপনা থেকেই উৎসারিত হয়ে এসেছে, কিন্তু নিতান্ত মেয়েলি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া হিসেবে সেগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে অপাংক্তেয় ছিল বহুকাল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সেই সব ধুলোবালি মাখা ছড়ানো ছিটানো অনাদৃত গ্রাম্য ছড়াগুলির মধ্যে চিরন্তন সাহিত্যরসের সন্ধান পান। সেগুলির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন এক সুকুমার সৌন্দর্য। একান্ত শৈশবে বাড়ির দাস-দাসী ও নানা জনের মুখে শোনা ছড়াগুলি তাঁর নবীন শিশুমনকে শুধু মাতিয়ে তোলেনি, সেগুলির স্মৃতি তাঁর জীবনপ্রান্তেও উজ্জ্বল হয়ে ছিল। ছড়ার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ কবি তাই পরবর্তী জীবনে নিজেও যেমন ছড়াগুলির সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির অন্যান্যদেরও এ কাজে উৎসাহিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকেও তিনি পরামর্শ দেন প্রাচীন ছড়াগুলির সংগ্রহে উদ্যোগী হতে। রবীন্দ্রনাথই শ্রুতিনির্ভর বাংলা ছড়া সংগ্রহের প্রথম পথিকৃৎ। তাঁরই প্রযত্নে এই অমূল্য অতুলনীয় ছড়াগুলি প্রাকৃতজনের মুখ থেকে বাংলা সাহিত্যের সম্ভ্রান্ত দরবারে যথোচিত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিস্মৃত প্রায় এইসব জাতীয় সম্পদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং এগুলির অন্তর্গত জীবন-রস ও সাহিত্য-মূল্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল, এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র

বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।'

সংগৃহীত ছড়াগুলি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে সেগুলির ভূমিকা হিসেবে কবি লিখেছিলেন :

'আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্য কর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে। সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন।

'শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে বিষয়ে বোধকরি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুরনিক্বণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পটপরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।'...

এই ছড়াগুলিতে কবি রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন—'দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা', শুনেছেন—'স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু।' আর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দেখেছেন ছবির পর ছবি—'যেমন গ্রামের খবর মুখে-মুখে, তেমনিভাবে ছড়াগুলোর মধ্যে নানা ছবি নানা খবর রয়ে গেছে। কারা যে সে-সব খবর ছড়ায় ধরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে দেশে, তাদের নাম জানা যায় না, কিন্তু এই সব ছড়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের সুর, তাদের চোখের দেখা সুস্পষ্ট এসে পৌঁছোয় এখনো, আমাদের কাছে! আমাদের মায়ের চোখের দেখার মধ্য দিয়ে, মুখের কথার মধ্য দিয়ে! কত কালের কত মাসি-পিসির মামা-মামির দাদা-দিদির কত খবর, কত কালের দেখা ষষ্ঠীতলা, রথতলা, অপার নদী, তেপান্তর মাঠ, কত দুঃখের দিনের সুখের দিনের ঘরের বাইরের ছবি যে এসে যায়, তার ঠিকঠিকানা নেই—পুরো ছবি, ছেঁড়া ছবি, পুরো সুর, ভাঙা সুর।'

অবনীন্দ্রনাথের কথায়—'ছড়ার মধ্যে খেলার ছলে বাংলার ছেলেমেয়ে ও মায়ের জীবনের একটা দিক নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে গেছে এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশ বাংলার দৃশ্য পশুপক্ষী ঘরবাড়ি অশন-বসন আচার-ব্যবহার সমস্তই কোনোটা ছবির মতো আঁকা,

কোনোটা পুতুলের মতো গড়া, কোনোটা গল্পের মতো, কোনোটা নাটকের আকার।'

ছড়ার দুটো দিক দেখেছেন তিনি—'একদিক হচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ছোটোখাটো সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তার বাঁধন, আর একদিকে হল ছড়াটা সম্পূর্ণ মুক্ত, কল্পনা ও অবাস্তবের রাজ্যে। একই ছড়ার মধ্যে দিয়ে এই রকম বাস্তব অবাস্তব দুইয়ের ঢেউয়ের খেলা দেখি।'

আচার্য সুকুমার সেন ছড়াকে অভিহিত করেছেন 'শিশু-বেদ' রূপে। তাঁর কথায়—'যে রচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের তৈরি বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোনো এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি, তবে অপৌরুষের ছেলেমি ছড়া গান গল্পকে শিশু-বেদ বললে বোধকরি খুব অসংগত হয় না। ঋক্-যজু:-সাম-অথর্ব প্রাচীন বেদ, মুনি-ঋষি-পণ্ডিতের ধর্মকর্মের বেদ। এ বেদ এক শিলাস্তম্ভের মতো ধ্রুব ও অবিকারী। শিশু-বেদ ধ্রুব অথচ অধ্রুব, তা দৃঢ়মূল ও সজীব অক্ষয়বটের মতো, যার বীজ বেদেরও অগোচরকালের, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব মহূর্তে যার পাতায় শুয়ে শিশুব্রহ্ম পায়ের বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে কারণার্ণবে প্লবমান ছিলেন, যে অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় যুগ যুগ ধরে মানবহৃদয়ের আনন্দরস চিকমিকিয়ে উঠেছে, যার ফুল কত গানে কত সুরে ঝরে এসেছে, যার ফল কত শিল্পে কত চিন্তায় বিকীর্ণ হয়েছে, যার শাখা থেকে কত ইতিহাস-কাহিনী উদ্‌গত হয়েছে, যার ঝুরি বেয়ে কত মহৎ চিন্তা মানবচিত্তভূমিকে উর্বর করে এসেছে।'

অনেকে মনে করেন, বাংলা 'ছড়া' কথাটি গড়ে উঠেছে সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে। মুখে মুখে উচ্চারিত যে সকল শব্দ-ধ্বনি-ছন্দের ছটা ছড়িয়ে যায় মুখ থেকে মনে, তাই হল ছড়া। এ সব ছড়া কখনো কিছু অর্থবহ, কখনো সম্পূর্ণ অর্থহীন। আবার কারো কারো মতো কবিতাছত্র বা ছত্রাংশ থেকে 'ছড়া' কথাটির সৃষ্টি, ড: সুকুমার সেনের মতে যার অর্থ হল 'ছুট্‌কো ছন্দময় রচনা'। কিন্তু অভিধানিক অর্থ যাই হোক্ না কেন, ছড়া কাটার রীতি চলে আসছে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। এই ছড়া কাটার ব্যাপারটা গোড়ায় ছিল মূলত মেয়েদের দখলে। আগেকার দিনে কারণে অকারণে নানা ধরনের ছড়া কাটত মেয়েরা—কখনো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ভোলাতে, আদর করতে, তাদের ঘুম পাড়াতে, ভয় দেখাতে, কখনো আবার নিজেদের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতার ছলে। সেসব ছড়ার এক বিশেষ চলন ছিল, ছন্দ ছিল—যার ভঙ্গিটি বেশ মজাদার ও মনোমুগ্ধকর। সেই মেয়েলি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া-ই একালের কবিদের কলমে নতুন থেকে নতুনতর রূপে ছড়িয়ে চলেছে আজও।

বাঙালি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এই ছড়াগুলি সাধারণ ভাবে 'ছেলেভুলানো ছড়া' হিসেবে পরিচিত হলেও নিছক ছেলে ভোলানো-ই বোধহয় এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। এগুলির ভাব, রস ও বিষয়বস্তু বিস্ময়কর ভাবে বহু-বিচিত্র ও বহু-বিস্তৃত। বাঙালির হারিয়ে-যেতে-বসা নিভৃত ঘরোয়া জীবনের কতরকম বর্ণ-গন্ধ-মাখা টুকরো টুকরো ছবি

যে ফুটে উঠেছে এই ছড়াগুলির স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভঙ্গিতে! সে কথা ভেবে চেষ্টা করেছিলাম ছড়াগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে—যেমন : ক. খোকা-খুকু, খ. শাশুড়ি-বউ, গ. ঘর-গেরস্থালি, ঘ. রঙ্গরস, ঙ. ব্রত-পার্বণ ইত্যাদি। কিন্তু এক-একটা ছড়ার মধ্যে অনেক ভাবের বা রসের কথা এমন একাত্ম হয়ে মিশে আছে যে, সেগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়-ভুক্ত করা অসম্ভব। তাই নিরুপায় হয়ে বর্ণানুক্রমিক ভাবেই সাজিয়ে দিয়েছি ছড়াগুলিকে।

এই সংকলনের ছড়া সংগ্রহে আমি প্রধানত নির্ভর করেছি প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'খুকুমণির ছড়া', কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত 'আইকম বাইকম', অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত ছেলেভুলানো ছড়া' এবং ভবতারণ দত্ত সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলার ছড়া'। এছাড়াও আমাকে সাহায্য করেছে আমার নিজের ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কিছু স্মৃতি। যেহেতু এই সংকলনটি সাধারণ বাংলাভাষা-ভাষী শিশু-কিশোরদের জন্য, তাই নানা আঞ্চলিক ভাষার বহু ছড়া সেগুলির অর্থের দুর্বোধ্যতার জন্য আমি পরিহার করেছি। নিশ্চয়ই আরো অনেক মূল্যবান চিত্তাকর্ষক ছড়া আমার অক্ষমতার কারণে এই সংকলনের বাইরে থেকে গেল। আশা রাখি, ভবিষ্যতের কোনো যোগ্যতর সংকলক আরো পূর্ণতর সংকলন প্রস্তুত করবেন।

আগ্রহী পাঠকদের জন্য রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ রচনা 'ছেলেভুলানো ছড়া' সংযোজিত অংশে সন্নিবিষ্ট হল।
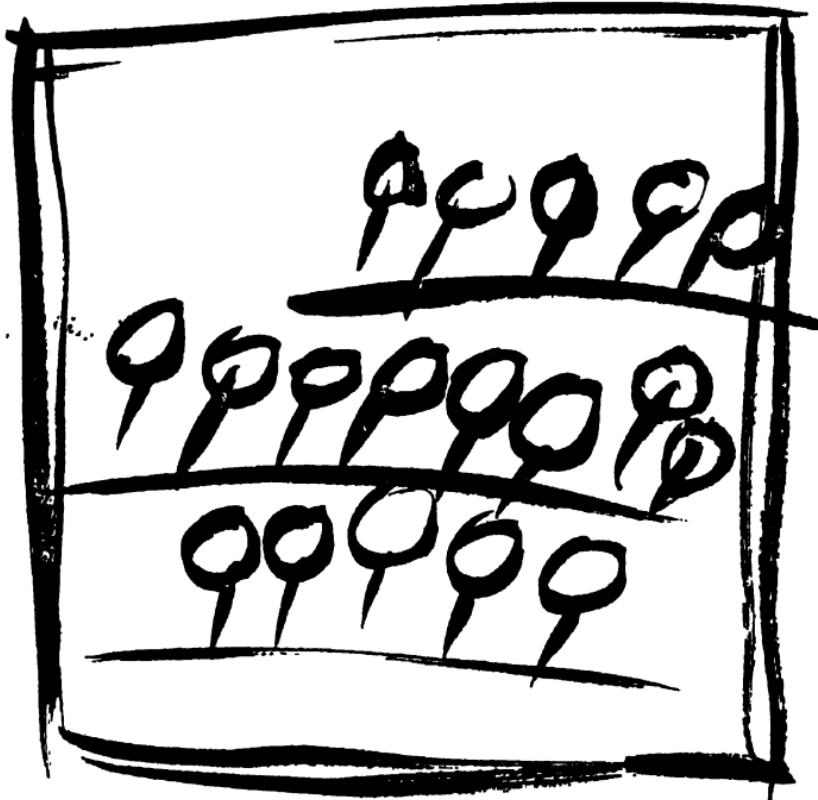
সুনীল জানা

১

অনুপমা দুধের সর
চায় না যেতে পরের ঘর।
বাপ বলেছে—আয় আয়,
মা বলেছে—থাক্।
বউ বলেছে—দূর করে দাও,
শ্বশুরবাড়ি যাক॥

২

অন্ধকারে ঘুরঘট্টি
চোরের মায়ের ভিরকুট্টি
জোচ্ছনায় ফটিক ফোটে
চোরের মায়ের বুক ফাটে॥

৩

অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব লো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর,
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয় গে মায়ের বাড়ি।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা,
বাপে দিলে শাড়ি।
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা
চল শ্বশুরবাড়ি।
(ঝপ্ করে মা বিদেয় কর্,
রথ আসছে বাড়ি।)
আগে যায়রে চৌপল,
পিছে যায় রে ডুলি।
দাঁড়া রে কাহার মিন্‌সে,
মাকে স্থির করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর,
আপুনি ভাবিয়ে দেখ, কার ঘর কর॥

৪

অনেক দিনের কথা, সই মনে পড়েছে।
সোনার যাদু গোপাল আমার গান ধরেছে।
এমনি করে কেমন ধারা গান গাইতে, সই,
ধেই ধেই ধেই খোকা নাচে—
ধেই ধেই ধেই ধেই

৫

অবু থবু গিরি সুত
মায়ে বলে, পড় পুত
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি॥

৬

অভদ্রা বর্ষাকাল
হরিণ চাটছেন বাঘের ছাল।
শোন্ রে হরিণ তোরে কই
সময় বিশেষে সকল সই॥

৭

অলকমণি রাজার রানি কী বলিব আর।
অলকমণির কপাল পুড়ে হল ছারখার।
দু-দুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে,
দুটো দুটো কাহার দিলুম কাঁধে করে নিতে।
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথে জল খেতে।
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায়,
বাতি দিতে রাজপুরীতে কেউ নাইকো হায়॥

৮

অলি ফুলের কলি
বেলফুলের গাঁথনি।
চম্পাফুলের সাইর নাচে
নাচে ঠাণ্ডা মণি।

কার নুনাইয়া কার সোনাইয়া,
কনে থুইয়ে চুল।
চুলের ভিতর বেলের মালা
লাখ টেকার মূল॥

৯

অশথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি
হাতা হাতা হাতা
খা সতীনের মাথা॥

১০

আইকম্ বাইকম্ তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি।
রেল কম ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম॥

১১

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সুয্যি গেছে পাটে।
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে।
পদ্মদিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নিচে দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল।

বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা
　　জল শুখানো ভার।
জল আনতে খুকুমণি
　　যায় না যেন আর॥

১২

আকাশ ডাকে হুড়্হুড়্
খোকা চায় নলি গুড়।
ছেলের মাথায় আমড়া পাতা
ছেলে বলে, বাবা কোথা?
বাবা গেছে কাছারি
শুকনো মাছের তরকারি॥

১৩

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা—
সূয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়াপান কিনে খাই।
একটা পান ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্।

আমি তো বটে নন্দঘোষ,
মাথায় কাপড় দে।
হলুদ বনে কলুদ ফুল—
তারার নামে টগর ফুল॥

১৪

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দুক সাজায়ে।
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি ভরিয়ে।
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন কালামুখী বলে॥

১৫

আটকৌড়ে বাটকৌড়ে
ছেলে আছে ভালো?
মার কোল জোড়া করে
বাপের দাড়ি ধরে নাচ॥

১৬

আট বার বছরের গৌরী তের নয়রে পড়ে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছা আমার মায়ের আঁচল ধরে।
টাকা নয়রে কড়ি নয়রে কোটরে রাখিব
পরের লাগ্যা হইছে গৌরী পরেরে সে দিব।
অর্ধেক গাঙে ঝড় বৃষ্টি অর্ধেক গাঙে কুয়া
মধ্য গাঙে বাদ্য বাজে গৌরী লবার লইঞা।
আড়শি কাঁদে পড়শি কাঁদে কাঁদে রইয়া রইয়া
গৌরীর জনক কাঁদে গামছা মুড়ি দিয়া।
গৌরীর যে ভাই কাঁদে খেলার সাজি লইয়া
গৌরীর যে মায়ে কাঁদে শানে পাছার খাইয়া।

১৭

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা শাঁটুল
শামলা গেল হাটে।
শামলাদের মেয়েগুলি পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না আর কেঁদো না—
চালভাজা দেব।
আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব॥

১৮

আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর।
হনুমানের ন্যাজ ধরে
টানাটানি কর॥

১৯

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ।
কথা কও না কেন, বৌ?
কথা কব কি ছলে?
কথা কইতে গা জ্বলে!

২০

আতা পাতা লতা সাপ দেখ্‌সে লো।
কি সাপটা লো? খয়রাকাঁটা লো।
কাকে খেলো লো? বোদের মাকে লো।
কে ঝাড়বে লো? বামুন কাকা লো।
কোথা গেছে লো? কলকেতাতে লো।
কী আনতে লো? কাজললতা লো।

২১

আতাল পাতাল সামলা সাতাল
শ্যামের লতি, দুর্গাগতি
মায়ের দুধ, কৈতরের বাচ্ছা
তুলিয়া নাচা তুলিয়া নাচা॥

২২

আদুড় বাদুড় চালতা চাদুড়
কলা বাদুড়ের বে।
বাদুড় ঝুমকো নাড়া দে।
চামচিকেতে বাদ্দি বাজায়
খেংরা কাঠি দে॥

২৩

আদুড়ের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়
তালতলা দে খোকনমণি বিয়ে করতে যায়।
খোকনমণি, বিয়ে করে যোতুক পেলে কি?
থাল পেলুম গাডু পেলুম বড় মানুষের ঝি।
বড় মান্‌ষের ঝিকে নিয়ে উঠে দিলুম রড়
তালতলাতে পড়ে গিয়ে হাঁটুর গেল ছড়॥

২৪

আঁদুলে কুঁদুলের মাসি কলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা।
হাতে না মেলাম ভাতে মেলাম—
কল্লেম গঙ্গাপার।
রেতে না কেঁদো ছেলে, দিনে একটি বার॥

২৫

আঁধার ঘরের মানিক!
নড়ব না—চড়ব না—
দেখব খানিক খানিক॥

২৬

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
পরের ছেলে বাইর শুঁড়ো
ঘুরে ঘুরে আমি বুড়ো॥

২৭

আপিলা চাপিলা ঘন ঘন মাসি
নলের হুঁকায় রামের বাঁশি।
একা নল পঞ্চদল
কে রে খাবি কামার খল?
কামার বেটি ডুগ্‌ডুগানি
খড়ের উপর উঠল পানি
আপ্পন তাপ্পন
কুড়ে কুষ্টি ব্রাহ্মণ॥

২৮

আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।
অলরাইট ভেলি গুড্
পাঁউরুটি বিস্কুট
মেম খায় কুট্‌কুট্।
সাহেব বলে ভেরি গুড॥

২৯

আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই।
ঠাকুমা গেছেন গয়াকাশী, ডুগ্‌ডুগি বাজাই।
আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই
একটি দুটি পয়সা পেলে বাড়ি ফিরে যাই।

৩০

আ মরি সজনেডাঁটা
আগা সরু গোড়ায় মোটা।
তাতে দিয়ে সরষেবাটা
আলুর সঙ্গে ঘাঁটা ঘাঁটা।
রসময় তুমি হলে
যদি পড় রুইমাছের ঝোলে॥

৩১

আমার আঁধার ঘরের মণি।
লাফ দিয়ে দিয়ে খাবে আমার
শিকেয় তোলা ননী॥

৩২

আমার কত দুখের ধন।
দুঃখহরা দুখ-পাসরা
দুঃখ-নিবারণ॥

৩৩

আমার কথাটি ফুরোল
নটে গাছটি মুড়োল।
কেন রে নটে মুড়োলি?
গরুতে কেন খায়?
কেন রে গরু খাস্?
রাখাল কেন চরায় না?
কেন রে রাখাল চরাস্ না?
বউ কেন ভাত দেয় না?

কেন রে বউ ভাত দিস্ না?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না?
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না?
জল কেন হয় না?
কেন যে জল হোস্ না?
ব্যাঙ্ কেন ডাকে না?
কেন রে ব্যাঙ্ ডাকিস্ না?
সাপে কেন খায়?
কেন রে সাপ খাস্?
খাবার ধন খাবনি? গুড়গুড়িতে যাব নি?

পাঠান্তর ঃ
('কেন রে বউ ভাত দিস্ না' থেকে)
কেন রে বউ ভাত দিস না?
ছেলে কেন কাঁদে?
কেন রে ছেলে কাঁদিস্?
পিঁপড়ে কেন কামড়ায়?
কেন রে পিঁপড়ে কামড়াস্?
কুটুস্ কুটুস্ কামড়াব,
গর্তের ভিতর সেঁধোব॥

৩৪
আমার খুকি দুধের সর
কেমনে যাবে পরের ঘর।
পরে মারলে গালে চড়
গাল করবে চড়্চড়্॥

৩৫

আমার খোকনবাবু লক্ষ্মী
গলায় দিব তক্তি।
কোমরে দিব হেলা।
থাকুর থুকুর করে আমার
বড়ো মান্‌ষের ছেলা॥

৩৬

আমার খোকাবাবু যায়
লাল মোজা পায়।
বড়ো বড়ো বাপের বেটি
উঁকি দিয়ে যায়।
খোকা ধীরে চলে যায়॥

৩৭

আমার খোকা যাবে গাই চরাতে
গাই-এর নাম হাসি।
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব
মোহন-চূড়া বাঁশি॥

৩৮

আমার খোকা যেন ছবি আঁকা।
হাসি হাসি আসি
মায়ের কোলে বসি
মুখে দুধ খায়,
পা দুটি দোলায়,
কোলেই ঘুমায়॥

৩৯

আমার এ ফুলপড়া যে খোঁপায় পরে
রাতভোর তার মন আনচান করে।
ঢুলুঢুলু আঁখি তার রাধা রাধা ভাব
সাত সায়রের পাখি তুই আড়ে আড়ে নাব্॥

৪০

আমার ছেলে আমার কোলে
গাছের পাখি গাছের ডালে।
খোকা ডাকে, আয়রে পাখি
তোরে দেখে হব সুখী॥

৪১

আমার নাম পাঁচকড়ি
শুনলে বলবে গল্প করি।
ওই তালগাছটা আমার হাতের ছড়ি
আশি মন নাস্তা করি।
একদিন গেলাম শ্বশুর বাড়ি
তাদের বাড়ি ঢাকা জেলা।
বোয়াল মাছ আনল ধরি,
দেড় হাত দিল ভুনা করি।
শালা-শালি তিন কুড়ি
তারা লাগাল মারামারি।
আমি তখন কেটে পড়ি
আমার নাম পাঁচকড়ি॥

৪২

আমানির ডাবা নুনের থোবা
তবে হবে ভোজনের শোভা।
বারোটা মান তেরোটা ওল
তবে হবে একটু শুক্তুনির ঝোল।
বারোটা কলাগাছ কলায়ের বড়ি
তবে না হল একটু থোড় চচ্চড়ি
খেয়ে দেয়ে বৌ শুলেন খাটে
তিনটে চাকরে আম কাটে।
বেলা গেল মন সন্ধে হল
মণ ষোল মুড়কি এল।
রাম রাম বলে রাত পোয়াল
তেল মেখে বৌ নাইতে গেল।
বৌ যান নাইতে
শাক আনে চাইতে চাইতে।
শাক বলে আমার তনু শেষ
বৌয়ের জ্বালায় ছাড়লাম দেশ॥

৪৩

আমার মনুর বে।
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন
বাজনা শোনো সে॥

৪৪

আমার সোনার বাছা—
রুপোর খাঁচা
তুলে নাচা রে।

ঠকেরা দেখতে নারে
ফেটে মরে
পাড়া ছাড়ে রে॥

৪৫

আমি বাঁশতলার বুড়ি
　　নাকে মাটি খুঁড়ি।
দুষ্টু ছেলে দেখতে পেলে
　　পেটের মধ্যে পুরি॥

৪৬

আমি সদাগরের ঝি।
আমি কি অমনি রেঁধেছি।
বাড়ির বেগুন কাঁচকলা আর পটল রেঁধেছি।
চালে আছে চালকুমড়ো শিকেয় আছে ঘি
আমি কি অমনি রেঁধেছি॥

৪৭

আমের ডালে মুকুল দোলে থোপা কচি পাতা
বরের গায়ে হলুদ দিয়ে খাব সতীনের মাথা।
শীতের ভয়ে জড়সড় আমরা দুটি বোনে
দাদার কাছে বসে বউ হাসছে ঘরের কোণে।
দেখে যা লো দেখে যা লো ওরে পড়শির ঝি
কুয়োর মাঝে ফুটল ছবি তোরা করবি কি॥

৪৮

আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
সোনার থালে ভাত দেব
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা॥

৪৯

আয় আয় তুতি
খেতে দেব দুধি।
আয়রে পাখি লেজঝোলা
খেতে দেব খই্ কলা॥

৫০

আয় আয় তুতু
খেতে দেব দুধু।
লেজটি তুলে নাচবি সুখে
হাসবে সোনার খুকু॥

৫১

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে।
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে॥

৫২

আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম
খোকার চোখে আয়।
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি
ঘুমের বাড়ি যায়।
পাড়ার যত ছেলেদের ঘুম
সোনার চোখে আয়॥

৫৩

আয় ঘুম আয়
তাদের শেয়ালে শশা খায়।
তারা লুন কোথা পায়?
আলুন আলুন খেয়ে তারা
বনেতে পালায়॥

৫৪

আয় ঘুম ভাসিয়া
চোখে বোসো হাসিয়া।
কপালে বসে কর খেলা
ঘুমোয় খুকু দুপুরবেলা॥

৫৫

আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতোল খায়।
নদীর বালি ঝুরঝুরানি
নুন বলে খায়॥

৫৬

আয় ঘুমানি আয়
ভালুকে তেঁতোল খায়।
তারা নুন কোথা পায়?
শেওড়া গাছের নুন
কুসুম গাছের তেল
তারা তাই দিয়ে দিয়ে খায়

৫৭

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দেব বাড়িয়া।
মাছ কেটে মুড়ো দেব
ধান ঝেড়ে কুঁড়ো দেব
রাঙা সুতোর কাপড় দেব
চড়ে বেড়াতে ঘোড়া দেব
খোকার কপালে টুকু দিয়ে যা॥

৫৮

আয় তো ভোঁদড়, যায় তো ভোঁদড়,
ঘন ঘন মাছ খায় তো ভোঁদড়,
নায়ের কাছে যায় তো ভোঁদড়॥

৫৯

আয় চাঁদ আলো করে
দিঘির জল কালো করে—
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
সোনার থালে ভাত দেব
গাই বিয়োলে বাছুর দেব
রুপোর বাটিতে ব্যান্নন দেব
ক্ষীর খেতে খুরি দেব
বসতে পিঁড়ি দেব
রাজার মেয়ে বে দেব—
সোনার কপালে আমার টিপ দিয়ে যা

৬০

আয় তো পুষু খেয়ে,
খোকা আমার দুধ খায়নি
মিউ মিউ কর্ খেয়ে।
খোকা দুধ খাবে ঘট্‌ঘট্
পুষু আসে খট্‌খট্
খোকার দুধ খাওয়া হল সাঙ্গ,
বিড়ালের দেখ রঙ্গ॥

৬১

আয় তো ভোঁদড় যায় তো ভোঁদড়
ঘন ঘন মাছ খায় তো ভোঁদড়
নায়ের কাছে যায় তো ভোঁদড়॥

৬২

আয় ধুব্‌ড়ি, ছায় ধুব্‌ড়ি, ধুব্‌ড়ি আমার গায়।
চড়বড়িয়ে বেত মারলে পড়পড়িয়ে যায়॥

৬৩

আয় না চাঁদ আয় না,
গড়িয়ে দেব গয়না।
দু-হাতে বালা দেব,
দু-কানে দুল দেব,
গলে দেব হার,
তোরে কত দেব আর—
ঘুঙুর দেব পায়,
তুই খুকুর কাছে আয়॥

৬৪

আয় পাখি লেজঝোলা
তোকে দেব দুধকলা।
দেখে যা আমার নলিনবালা
শুয়ে কেমন করছে খেলা।
মুখে তুলেছে থুতু গাঁজলা
চোখে মেখেছে কলি-কাজলা
আমার নলিনকে নিয়ে করসে খেলা॥

৬৫

আয় বৃষ্টি ঝুড়িয়ে
কাক দেব পুড়িয়ে
কাকটা মরে ধড়ফড়িয়ে
বৃষ্টি এল চড়চড়িয়ে॥

৬৬

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি কষে
আমরা থাকি বসে।
লেবুর পাতায় করম্‌চা
সব বৃষ্টি ধরে যা॥

৬৭

আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে।
ছাগলার মা বুড়ি কাঠ কুড়ুতে গেলি,
ছ-খানা কাপড় পেলি ছ-বউকে দিলি।

আপনি মরিস জাড়ে কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে ঢুপ্‌ঢাপ্‌, বুড়ি খায় গুপ্‌গাপ্‌।
আয়রে বুড়ি কামার বাড়ি
তোকে দেব হাতা বেড়ি।
আয়রে বুড়ি কুমোর বাড়ি
তোকে দেব হাঁড়িকুড়ি।
আয় বুড়ি ঢাকা
তোকে দেব টাকা।
আয়রে বুড়ি কলকেতা
তোকে দেব ছেঁড়া কাঁথা।
আয়রে বুড়ি বর্দ্ধমান
তোকে দেব জলপান।
বর্দ্ধমানের রাঙামাটি
বুড়িকে ধরে কচ্‌ করে কাটি॥

৬৮

আয় মণি সায়মণি রতনমণির কোলে
হাসিমুখে মনের সুখে খোকনমণি দোলে।
খোকন কেমন সেজেছে
পায়ের নূপুর বেজেছে!
দোলে রে আমার ধনসোনা
মুখখানি তোর চাঁদপানা॥

৬৯

আয় মেনি পুষ্‌ পুষ্‌
দুধ খাবি আয়।
মাছ মেখে ভাত দেব
হাত দেব গায়॥

৭০

আয়রে আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে মোর টি দিয়ে যা
বাঁশবনের ভিতর দিয়ে
সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে
লাল সাগরের উপর দিয়ে
আয় চাঁদ আয়।
চাঁদ তো শোনে না কথা, হেসে ভেসে যায়।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
রাঙা সুতোর কাপড় দেব
কালো গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
হাতে দেব কলা।
মনুর সাথে এসে কর খেলা
আয় চাঁদ আয়॥

৭১

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পন কড়ি গুনতে গুনতে যাই।
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুরঝুর করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

পাঠান্তর ঃ
বকুলতলার ঘাটে রে ভাই ঝুরঝুরে বালি।
সোনামুখে রোদ লেগেছে, তুলে ধর ডালি॥

৭২

আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পন কড়ি গুনতে গুনতে যাই।
বড়ো শাঁখাটি ছোটো শাঁখাটি ঝুমুর ঝুমুর করে,
তিন কড়ার খয়ের কিনে দুগ্‌গা হেন জ্বলে।
আজ দুগ্‌গার অধিবাস কাল দুগ্‌গার বে,
তিন মিন্‌সে নেড়া ফকির কোমর বেঁধেছে।
কোমরে কদম্বের ফুল ফুটে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টে'
টিয়ের বাপের বে, লাল গামছা দে।
লাল গামছা খসর মসর, ধোপার বাড়ি দে।
ও ধুপুনি, ও ধুপুনি, কাপড় কেচে দে,
তোর বিয়েতে নাচতে যাব ঢুল্‌কি কিনে দে॥

৭৩

আয়রে আয় টিয়ে
আমার খুকুরানির বিয়ে।
আয়রে আয় সাঁঝের বায়
আমার খুকুমণি ঘুম যায়।
আমার খুকুর গলায় মোতির মালা
আমার খুকুর হাতে হিরের বালা।
আমার খুকুর কানে সোনার দুল
আমার খুকুর মাথায় চাঁপা ফুল॥

৭৪

আয়রে আয় টিয়ে
ঘোষের পাড়া দিয়ে।
খোকা আমার পান খেয়েছে
শাশুড়ি বাঁধা দিয়ে॥

৭৫

আয়রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা॥

৭৬

আয়রে আয় টিয়ে পাখিটি
নিয়ে যা খোকার খাঁদা নাকটি।

৭৭

আয়রে আয় নিদান বুড়ি নিদের পাড়া যাবি
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খাবি।
হাটের বাটের নিদ এনে খোকার চোখে দিবি

৭৮

আয়রে আয় পাখি
তোকে খাঁচায় পুরে রাখি।
খাবিদাবি কচ্‌কচাবি
খোকন নিয়ে ঘুম করাবি॥

৭৯

আয়রে আয় ভালুকে তেঁতুল খায়
শেওড়াগাছে ছয় বুড়ি গাছ আঁচড়ায়।
শিলনোড়াতে লাল কোঁদল
সরষে মড়্‌মড়্‌ করে।
চালকুমড়োর সোহাগ দেখে
পুঁই কেঁদে মরে।
ওগো পুঁই কেঁদো না ধুলায় গড়িয়ে
আমার খোকন ভাত খাবে মাছভাজা দিয়ে॥

৮০

আয়রে আয় ভুঁড়ো শেয়াল
কুল পেকেছে।
আর যাব না বামুনপাড়া
বাম্‌নি লেজ কেটেছে।
কত রক্ত পড়েছে
কত ব্যথা হয়েছে
খোকন ওষুধ দিয়েছে
তবে ভালো হয়েছে॥

৮১

আয়রে আয় মেনি
খোকার দুধে চিনি,
দুধ খাবে না রাগ করেছে
খোকন যাদুমনি।
আয়রে আয় মেনি॥

৮২

আয়রে আয় সোনার পাখি
তোরে হেরে জুড়াই আঁখি।
আনবি বাছি বাছি ফল রসাল
চুষে চুষে খাবে আমার গোপাল।
তোরে দেব দুধু ভাতি
তুই হবি গোপালের সাথি॥

৮৩

আয়রে আয় সাঁঝের বা,
খুকুরে ঘুম পাড়িয়ে যা।
খুকুর গলায় মোতির মালা
খুকুর হাতে হিরের বালা
খুকুর কানে সোনার দুল
খুকুর মাথার চাঁপা ফুল
দুলিয়ে যা॥

৮৪

আয় ঘুম যায়রে ঘুম
ঘুম কুচুলের পাতা।
নাচ দুয়ার দিয়ে ঘুম যায়
দুটো মাগুর মাথা॥

৮৫

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা
দুয়ারে বাঁধা হাতি।
চোখ ঢুলঢুল্ নয়নতারা
দেখ্‌সে চাঁদের বাজি॥

৮৬

আয়রে চাঁদা বস্‌ রে ডালে
ভাত দেব তোকে সোনার থালে
পঞ্চাশ ব্যান্নন যত পারো খেয়ো,
খোকার কপালে আমার
টিপ দিয়ে যেয়ো॥

৮৭

আয়রে চাঁদা বাছুর বাঁধা
গোয়ালে বাঁধা গাই।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ ধরলে মুড়ো দেব
কালো গরুর দুধ দেব
দুধ খেতে বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা॥

৮৮

আয়রে চাঁদা হেসে
মাদার গাছে বসে।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কুটলে মুড়ো দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা॥

৮৯

আয়রে পাখি আয়
কালো জামা গায়।
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
আমার যাদুর পায়॥

৯০

আয়রে পাখি আয়
গোপাল ডাকে আয়।
আয়রে পাখি হুমা
গোপালকে নিয়ে ঘুমা।
আয়রে পাখি লেজঝোলা
তোরে খেতে দেব দুধকলা।
খাবি দাবি কলকলাবি
যাদুকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি॥

৯১

আয়রে পাখি টিয়ে।
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥

৯২

আয়রে পাখি লেজ ঝোলা
গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা।
আয়রে পাখি হুমো,
খোকাকে নিয়ে ঘুমো।
খাবি দাবি কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি॥

৯৩

আয়রে সোনামণি
খেতে দেব ননী।
ভোজনে দেব মাছ,
চাঁদ ঘুঙুর কোমরে দিয়ে
ঝম্‌ঝমিয়ে নাচ॥

৯৪

আয়রে হনু লাফি লাফি
খোকা কাঁদছে ফুঁপি ফুঁপি।
দুধ দেখলে পালিয়ে যায়
কলা খাবি তো ধরবি আয়॥

৯৫

আয়রে হাওয়া ফুরফুরে
দূর হ' মশা মাছি।
খোকা যদি ঘুমাও তবে
আমি যে রে বাঁচি॥

৯৬

আয় হলদি আয়
হলুদ জানে না আপন পর
ভুইটে পেলে সে শিবের বর।
সাত নারী হলদি হাতে নিয়ে
আড়পাড় তড়কড় নাইল গিয়ে।
দু-কুড়ি ওঝা সদাই ধায়
হলদি পোড়ায় পেত্নি যায়।
ফুং হিং রিং স্বাহা ফট্॥

৯৭

আর কেঁদো না খুকুমণি
খেতে দেব দুধের ফেনি,
তাতে চাটিম কলা
যাবে পেটের জ্বালা॥

৯৮

আর ঠাট্টা কোরো না
ঠাট্টা আমি জানি।
ঠাট্টার রাজার ঠাট্টা দিয়ে
ঠাট্টা কিনে আনি।
কত ঠাট্টা করেছিল
কলকাতার এক বেনে,
পা হড়কে পড়ে ম'ল
কুমিরে খেলে টেনে॥

৯৯

আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কান্‌ছো বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর
পাড়া পড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর।
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেই দুর্গা হেই দুর্গা তোমার মেয়ের বিয়ে
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের ডালা কোন্ সোহাগির বউ
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বউ।
এক বাড়িতে দই দিব্য এক বাড়িতে চিঁড়ে
এমন করে ভোজন করো গোক্ষুনাথের কিরে॥

১০০

আলুপাতা আলুথালু বেগুন পাতা দই
সব জামাই খেয়ে গেল, বড় জামাই কই।
ঐ আসছে বড় জামাই লাল গামছা গায়
ঐ আসছে বড় জামাই ময়ূরপঙ্খী নায়॥

১০১

আলুপাতা থালুপাতা ভেরেণ্ডা পাতার ঝোল
সকল জামাই ভাত খেলে মা, মেজ জামাই কই?
কাপড় দিয়েছি থানে থানে, ঘটি দিয়েছি দানে
মেজ জামাই ভাত খায় নাই কিসের অভিমানে?

১০২

আলুর পাতা থালুরে ভাই ভেরেণ্ডা পাতা দই
সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই?
ওই আসছে ওই আসছে মাঠ আলো করে
নেচে নেচে হেলে দুলে ঢাকাই কাপড় পরে।
কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম কন্যে দিলাম দানে
তবু জামাই ভাত খান না কিসের অভিমানে?
কালো কালো মুখখানি তার কালো জামা গায়
অন্তর থেকে তির মেরেছে নীলমণির গায়।
নীলমণিরে ভাই
গাড়ু ভরে জল দাও, প্রাণ ভরে খাই॥

১০৩

আলতা পাতা চালতা পাতা বেনা পাতার সই
সব জামাই খেয়ে গেল ছোটো জামাই কই?
এক পো ধানের মাছ কিনলুম পিঁড়েয় বসে আছি
এই চিলটা নিয়ে গেল ঠ্যাং ধরে নাচি॥

১০৪

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই ভেল্লা পাতায় দই
সকল জামাই এল রে আমার খোঁড়া জামাই কই?
ওই আসছে খোঁড়া জামাই টুঙটুঙি বাজিয়ে।
ভাঙা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান
কেঁদো না কেঁদো না জামাই গোরু দিব দান
সেই গরুটার নাম থুইয়ো পুণ্যবতীর চাঁদ॥

১০৫

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বলি পড়ে পাঁঠা
কার্তিকে কালিকা পূজা ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রানে নবান্ন দেয় নতুন ধান কেটে
পৌষমাসে বাউনি বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে ভারা
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী বাটা জামাই আনতে দড়
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা যাত্রী হয় জড়ো।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা-ফেলা ঘি আর মুড়ি
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খান মনসা বুড়ি॥

১০৬

আসন পিঁড়ি পান পিঁড়ি
আয় রঙ্গ রাধা।
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুল।
আয় রঙ্গ হাটে যাই
পান গুয়োটা কিনে খাই।

কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে জামাই গা তোল॥

১০৭
আহ্লাদী যায় সরতে
　　সবাই যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী সরিস নি
　　লোকহাস্য করিস নি॥

১০৮
আহা কিবা মেয়ের ছিরি
যেন বাঁশবাগানের প্যারি।
আহা কিবা ছেলের ছিরি ছাঁদ
যেন গোবর-গাদার কালাচাঁদ॥

১০৯
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতোরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়মড়।
দাদা দিলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি।

কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতোরের মাথা॥

১১০

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পল্লো মাকড় চিচিং।
মাকড়েরা নড়ে চড়ে
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে।
এলের পাত বেলের পাত
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়িতে হল বেলা
খলসে মাছের চৌকা
উড়ে বসে পৌকা॥

১১১

উত্তর আলা কদমগাছটি
দক্ষিণ আলা বাও রে,
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই
ডাকে তোমার মাও রে।
শিয়রে চন্ননের বাটি
বুকে ছিটা পড়ে রে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই
ডাকে তোমার মাও রে।
কাঁসা বাজে করতাল বাজে
তবু সূর্য্যাইর ঘুম নাহি ভাঙে রে
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই
ডাকে তোমার মাও রে॥

১১২

উত্তরেতে মেঘ করেছে
　গোরু বেড়ায় উড়ে।
পেয়াদা ব্যাটা পাক বেঁধেছে
　সরু ধানের চিড়ে॥

১১৩

উনাই উনাই উনাই
　কাঠবিড়ালের ছা,
তোর মা বাড়ি নাই—
　শুয়ে ঘুম যা॥

১১৪

উপর কানে পিপুল পাতা
নীচের কানে দুল।
কোথা যাচ্ছ বকুল ফুল?
সন্ধেবেলা জলকে গিয়ে এলিয়ে প'ল চুল।
আমার কি হল বকুল ফুল॥

১১৫

উমার কুন্তল মেঘের মালা
এ বুড়ার জটা তামার শলা।
সিন্দুরের বিন্দু উমার ভালে
বুড়ার কপালে অনল জ্বলে।
চন্দন চর্চিত উমার গায়
আই আই ছাই বুড়ার গায়॥

১১৬

উলু উলু উলু
লক্ষ্মীমণির বিয়ে।
ধনমনিকে ডেকে আন
হলুদ বাট্‌সিয়ে।
আমার খোকনমণির বিয়ে
গায়ে হলুদ দিয়ে।
মুঠো মুঠো খৈ
ঝিনুক ঝিনুক দৈ॥

১১৭

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আসছে কত দূর।
বর আসছে বাঘনাপাড়া
বড়ো বউ গো রান্না চড়া।
ছোটো বউ লো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা।
ফুলের বরণ কড়ি
নটে শাকের বড়ি॥

১১৮

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আসছে কতদূর?
বরের মাথায় চাঁপাফুল
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরকে বিয়ে দেব
যার গোঁফজোড়াটি পাকা।

ভালো তো বেণী বিনিয়েছে রানি
বেণীর আগায় সোনার ঝাঁপা,
মাঝে মাঝে তার কনকচাঁপা॥

১১৯

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশি
নল ভেঙেছে একাদশী।
একা নল পঞ্চদল
মা দিয়েছে কামারশাল।
কামার মাগির ঘুরঘুরুনি
অর্পণ দর্পণ
কুড়িকুষ্টি ব্রাহ্মণ॥

১২০

এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
আমাদের পাড়ায় যাবি?
কেলে কুকুর কিনে দেব
ছেঁচকি করে খাবি॥

পাঠান্তর ঃ
এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
আমাদের পাড়ায় যাবি?
এক কলকে তামাক দেব
বসে বসে খাবি॥

১২১

এই ধনটা কে রে?
স্বর্গ থেকে মর্তে এসে
ছিষ্টি রেখেছে রে॥

১২২

এই মেয়েটা হত বেটা
দিতাম সোনার কোমর পাটা।
থাকত লোকে চেয়ে
আমার বড়ো সাধের মেয়ে॥

১২৩

এই হনুমান কলা খাবি?
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?
একটি করে পয়সা পাবি।

১২৪

একখান থালা দু-খান থালা
থালা ঝুম্‌ঝুম্‌ করে।
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে
কে নিবুতে পারে?
আমার ভাই বলরাম
সে নিবুতে পারে॥

১২৫

এক তারা বন্ধন দুই তারা বন্ধন
তারারা কয় ভাই—তারারা সাত ভাই
বেঁধে ফেলি বড় ভাই।
চন্দ্র গেলেন সূর্যের বাড়ি
বসতে দিলেন চৌকির পিঁড়ি।
বসব না আর পিঁড়িতে
মানুষ মরে ভাতে

গরু মরে ঘাসে
তাই এসেছি তোমার বাসে।
আমার কথাটি যেন থাকে
কালকের রৌদ্রে যেন বসুমতী ফাটে॥

১২৬

একদিনের হলুদ বাটা ওলো কন্যা
তিন দিনের বারি
ডান হাতে তেলের বাটি ওলো কন্যা
বাঁ হাতে ঝারি।
তুমি যাবে জলে জলে ওলো কন্যা
আমি যাব কূলে
তুমায় আমায় দেখা হবে ওলো কন্যা
খেল কদম মূলে॥

১২৭

এক নৌকো আলো চাল
এক নৌকো ঘি।
দাদা গেছেন বে' করতে
সওদাগরের ঝি।
নাড়া বনে কাড়া বাজে
লোকে বলবে কী।
সরা-চাটা বে করেছে
মালসা-চাটার ঝি॥

১২৮

এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হৈল?

তোর চুল, মোর পায়
আরো দিছি ছেলের গায়।
ছেলে মেয়ের বিয়ে গেছে
সাত রাত গান
কোন্ অভাগী ঘরে এল
তেলে প'লো টান॥

১২৯

এক পাথরে বেগুনভাজা
এক পাথরে ঘোল
নাচে তো কলা বউ
বাজে তো ঢোল।
গণেশের মা কলাবউকে
জ্বালা দিয়ো না
একটি কলা খেলে পরে
আর পাবে না॥

১৩০

এক পো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বলো না?
ক্ষীর হবে সর হবে
ছানা হবে মাখন হবে
ও বউমা, আর কি হবে বলো না?
এব্‌লা হবে ওব্‌লা হবে
উপেন খাবে বিপিন খাবে
কুঞ্জলাল কোলের ছেলে
তাকে একটু দিতে হবে।
সনাতন কেশো রুগি
তাকে একটু দিতে হবে

পাখিটা শুধু ছোলা খায় না
তাকেও একটু দিতে হবে
কর্তার দুধ না হলে চলে না
এ পোড়ার মুখে দই না হলে রোচে না
তাও একটু রাখতে হবে।
ও বউমা, আর কী হবে বলো না?

১৩১

একবার খাই ফেন ভাতে
একবার খাই ছেলের সাথে
একবার খাই তেনার পাতে
দেখে গিয়েছে সেই
নিয়ে বসেছি এই
তবু পাড়ার চোখ-খাকিরা বলে
রাতদিন খাই রাতদিন খাই॥

১৩২

এক যে আছে একানোড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মত
পিঠখানা তার কুলোর মত।
কান দুটো তার লোটা লোটা
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলির দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
যে ছেলেটা কাঁদে
তারে ঝুলির ভিতর বাঁধে,
গাছের উপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে॥

১৩৩

এক যে গাছ ছিল
লতায় লতায় লতিয়ে গেল।
তার এক কুঁড়ি ছিল
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল॥

১৩৪

এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেয়াল কাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন॥

১৩৫

এক যে ছিল বুড়ি
সে দিত হামাগুড়ি।
তামাক খাইত গুড়গুড়ি
চিড়া খাইত চুড়চুড়ি
নাকে দিত সুড়সুড়ি
পান খাইত চাপুড় চুপুড়
নাতিন জামাইর বাড়ি॥

১৩৬

এ যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কিপরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি—
ঠাকুরঝি।
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি।

১৩৭

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে,
খোকার মাকে নিয়ে গেল
ধামা ঢাকা দিয়ে।
উদ্‌বিড়ালে খুদ খায়
চালে নাচে ফিঙে,
পুঁটিমাছে গীত গায়
মাগুরে বাজায় শিঙে॥

পাঠান্তর ঃ

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে,
তার মা-কে ধরে নিয়ে গেল
বুড়ো বাঁদরে।
মাসি কাঁদে পিসি কাঁদে
চালে আছে ঝিঙে,
পুঁটিমাছে গীত গায়
নেউলে বাজায় শিঙে।

১৩৮

এক যে রাজা, সে খায় খাজা।
তার যে রানি, সে খায় ফেনি।
তার যে বেটা, সে খায় পাঁঠা।
তার যে বৌ, সে খায় মৌ!
তার যে ঝি, সে খায় ঘি।
তার যে চাকর, সে খায় পাঁপড়।
আর দেয় ঘুম।
তালগাছ পড়ে দুম্‌॥

১৩৯

এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
তার বাপের নাম রতা
ফুরুল আমার কথা॥

১৪০

এ করিলাম কী
জামাইকে দিলাম ঝি।
হারালাম লো
বউকে দিলাম পো॥

১৪১

এক সের ধানের খই ভেজে বসিয়েছি এক ডোল
এবার লোকের বড়ো গোল।
তিন সের ধানের চিড়ে কুটলেম মেয়ের কাজেতে
তা খেলে বাজে লোকেতে।
মধুখালি লোক পাঠিয়েছি ময়দার কারণ
কিছু নুচির আয়োজন।
তেল দিয়ে ভাজব নুচি মিশাল দেব ঘি
তোমরা খাবে তা কি।
এবার একটা আচ্ছা ফলার দেব মনের মত
খেয়ো পেট ভরে যত॥

১৪২

এক হাত লম্বা বলরাম
    দুই হাত লম্বা শিং।
নাচে রে বলরাম
    তা ধিন্ তা ধিন্॥

১৪৩

একা বুড়ি দোকা বুড়ি
তেকা বুড়ির ছাও।
খোকনমণি ঘুমায় না কো
তাকে নিয়ে যাও॥

১৪৪

একে বেড়াল কালো
তায় গাঙ্ সাঁতরে এলো
তায় পাঁশ-গাদায় শুলো
রূপে জগৎ আলো॥

১৪৫

এখন হাসিব কি—
চম্পক নগরে হাসির
বায়না দিয়েছি।
হাসির ষোলো টাকা মন।
হাসি মাঝারি রকম॥

১৪৬

এচক্ বেগুন পেচক হবে
ঝিঙে ধরবে মালি।
সোনার যাদু মা বলবে
ঘুচবে মনের কালি॥

১৪৭

এটা বলে খাব খাব
ওটা বলে কোথায় পাব?

এটা বলে ধার কর না।
ওটা বলে শুধব কিসে?
এটা বলে লবডঙ্কা!

১৪৮

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে
পরের বেটা মুখ করবে মুখনাড়া দিয়ে
দুই চক্ষুর জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

১৪৯
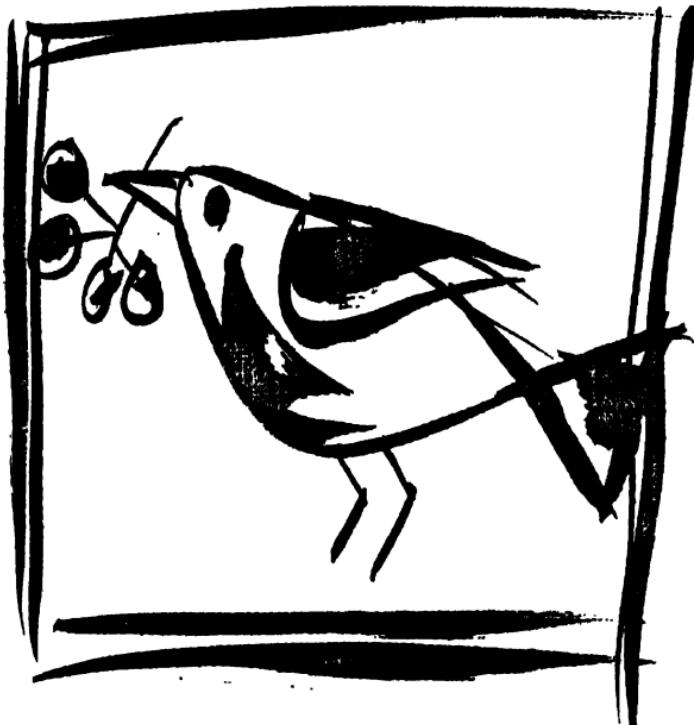
এতটুকুন জলে
মাছ কিলবিল করে।
রাজার বেটা পাথর কাটা
মাছ ধইরতে লারে॥

১৫০

এতদিন ছিল ধন কোন্ হিজুলির বনে
দুখিনির দুঃখ দেখে ভেসে এলেন বানে
ষষ্ঠীতলার বানে কুড়িয়ে পেলাম ধনে॥

১৫১

এতোল বেতোল তামা তেতোল
ধর্ তো বেতোল ধরো না।
ক'ধাপ খাবে বলো না?
ইশ্ বিশ্ ধানের শিষ্
ক' ধাপ খাবি বলে দিস্॥

১৫২

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারি মাঝে বসে আছে শিব সদাগর।
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে
জলপান করতে দিল শালি ধানের চিড়ে।
শালি ধানের চিড়ে নয় রে বিন্নি ধানের খই
মোটা মোটা সবরি কলা কাগমারি দই॥

১৫৩

এপারে ঢেউ ওপারে ঢেউ
মাঝখানে বসে আছে
গঙ্গারামের বউ॥

১৫৪

এপারেতে বেনা ওপারেতে বেনা
মাছ ধরেছি চুনোচানা।
হাঁড়ির ভিতর ধনে
গৌরী বেটি কনে।
নোকে বেটা বর
টাঁকশালাতে চাকরি করে ঘুঘুডাঙায় ঘর।
ঘুঘুডাঙায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে
ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়ো শাঁখা পরে
শাঁখাটি ভাঙল
ঘুঘুটি ম'ল॥

১৫৫

এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং চোর
মাই ফর ডিয়ার ফর্টি ফোর।
এক কাঠি চন্দন কাঠি
চন্দন বলে কা কা
ইজিক বিজিক সিজিক চায়
প্রজাপতি উড়ে যায়।
মেম খায় বিস্কুট
সাহেব বলে ভেরি গুড॥

১৫৬

এসো জামাই বসো খাটে
পা ধোও গে গড়ের মাঠে
পিঠ ভাঙব চেলা কাঠে
কেঁদে বেড়াবে মাঠে ঘাটে॥

১৫৭

এসো পৃথিবী বসো পদ্মে
শঙ্খ চক্র ধরি হস্তে।
খাওয়াব ক্ষীর মাখন ননি
আমি যেন হই রাজার রানি॥

১৫৮

এসো পৌষ যেও না
জনম জনম ছেড়ো না
পৌঝুরী গো এসো
পিঁড়ের উপর বসো।
হব তোমার দাসী
আনন্দেতে ভাসি॥

১৫৯

এসো রে আমার নীলমণি
কোলে করে তোমারে খাওয়াই ননি।
চুরি কেন কর ননিচোরা
এত খেয়েও পেট হয়নি ভরা॥

১৬০

এসো রে আমার লক্ষ্মীছেলে
ধুলোয় কেন পড়ি?
কেউ কি কিছু বলেছে রে
দিচ্ছ গড়াগড়ি।
দুধে ভাতে খাবে চলো রে
চলো আমার সোনা
যা চাইবে তাই পাইবে ধন
কেঁদো না কেঁদো না॥

১৬১

ঐ চাঁদটি কাদের?
কপাল ভালো যাদের।
ঐ চাঁদটি কী করে?
বউ নিয়ে খেলা করে॥

১৬২

ও আমার গোলাপ সুন্দরী,
গোলাপকে কে খাওয়ালে গুড় মুড়ি?
ও আমার গোলাপ সুন্দরী,
গোলাপ হাতি চড়ে ডঙ্কা মেরে
যাবেন নাচবাড়ি।
ও আমার গোলাপ সুন্দরী॥

১৬৩

ও আমার নেংটি বাবাজি।
মট্‌কায় বসে কাটুর কুটুর
বাওনায় বসে কর কী?
ও আমার নেংটি বাবাজি॥

১৬৪

ও আমার যাদু বাছা কোন্ বনেতে যায়
পিঁজরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া না চায়॥

১৬৫

ওখানে কে রে? আমি খোকা।
মাথায় কি রে? আমের ঝাঁকা।
খাস নে কেন রে? দাঁতে পোকা।
বিলুস্ নে কেন রে? ওরে বাবা!!

১৬৬

ও গৌরী, না গিয়া
পান্তা ভাত খা গিয়া।
পান্তা ভাত শলা শলা
পুঁটিমাছ চলা চলা॥

১৬৭

ও জামাই খেয়ে যা রে,
সাধের নতুন তরকারি।
শিল-ভাতে নোড়া ভাজা
কোদাল চড়্চড়ি॥

১৬৮

ও পথে যেয়ো নাকো
হিটিম্‌টিমের ভয়
তিন মিন্‌সে গন্নাকাটা
নাকে কথা কয়॥

১৬৯

ও পাড়াতে যেও না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পাতের ভাত খেয়ো না
ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে
ঢাকন খুলে দেখ বড়ো বউর
খোকা হয়েছে॥

১৭০

ওপারে এক ময়রা বুড়ো
রথ করেছে তের চুড়ো।
বাঁদরে ধরেছে ধ্বজা
দিদি গো দেখ্‌সে মজা॥

১৭১

ওপারে জন্তিগাছটি জন্তি বড়ো ফলে
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আইঢাই গলা হল কাঠ
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান
পান কিনলাম চুন কিনলাম ননদে ভাজে খেলাম
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দেলাম।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইক বাড়ি
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি।
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে
সুবলকে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে।
দিঙ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
পরণে তাদের ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে।

গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ফুটেছে।
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ লেগেছে।
দু-দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মা-র বিয়ে
লাল গামছা দিয়ে।
গৌরী বেটি কনে
লকা বেটা বর।
ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্ বাদ্যি বাজে চড়কডাঙায় ঘর॥

১৭২

'ওপারেতে কালো রঙ্
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ঝম্।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

'এ মাসটা থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে।'

'হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি
আয়রে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

১৭৩

ওপারেতে কুলগাছটি নৈ ছাগলে খায়
তার তলা দে আমার খোকন বিয়ে করতে যায়।
বিয়ে করতে গিয়ে খোকন কী পায় যতুক্
হাতে পায়ে হীরের বালা মাথায় মটুক।
শাশুড়ি এসে বলে, জামাই কেমন কালো।
শ্বশুর এসে বলে, জামাই ঘর করেছে আলো॥

১৭৪

ওপারেতে তিলগাছটি তিল ঝুরঝুর করে
তারি তলায় মা আমার লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী ঘর নিকুচ্ছেন
বাবা আমার বুড়ো শিব নৌকা সাজাচ্ছেন।
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ওই আসছে পাখনা বিবি প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্
ও দাদা দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্॥

১৭৫

ওপারেতে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে লাল লাঠিখান ফেলে মেরেছে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা, একটা নিলে কিঁয়ে,
ঢোকুম্‌কুম্ বাজনা বাজে, অকার মার বিয়ে॥

১৭৬

ওপারের কলাগাছটি লম্বা লম্বা চুল
ঢাক বাজে ঢোল বাজে কোন্ গাঁয়ের বর
দুষ্ট মাগি শাশুড়ি কনে বার কর।
বার করেছি বার করেছি জলের ঝারা দিয়ে
রামমনিকে নিয়ে যাব বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা
রামধনুকের বাদ্দি বাজে সীতারামের খেলা।
নাচ তো বাপু সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দিব টেঁপর ভরিয়ে।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথা কোথা জল পাব তিরপুনির ঘাট।

তিরপুনির ঘাটে রে ভাই ঝুরঝুরে বালি
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।

১৭৭

ওপেনটি বাইস্কোপ
টাইটুই টেইস্কোপ।
চুলটানা বিবিয়ানা
সায়েববিবির বৈঠকখানা।
কাল বলেছেন যেতে
পান সুপারি খেতে।
পানের মধ্যে মৌরীবাটা
ইস্কাবনের চাবি আঁটা।
আমার নাম রেণুবালা
গলায় দিছি মুক্তার মালা

১৭৮

ও বউ, ফুট্ করল কী?
কাঁঠাল বিচিটি।
আন্ দেখি রে খাই।
পুড়ে হয়েছে ছাই।
তোর ভায়ের মাথা খাই।

১৭৯

এ বিশে, খাজনা দিসে।
আজ মাসের উনত্রিশে॥

১৮০

ওরে আমার কালো সোনা
বউ মেরেছে তিনটে ঠোনা
তা বলে কি দুধ খাবে না।
বেঁচে থাক্‌রে চূড়া বাঁশি
কত শত আসবে দাসী।
সবাই মিলে খেলে ননি
বাঁধা গেল আমার নীলমণি॥

১৮১

ওরে আমার তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে
চিবিয়ে মলেম আমি॥

১৮২

ওরে আমার ধন
যেও না রে বন।
তোমার তরে গড়িয়ে দেব
রত্ন সিংহাসন।
বাড়ির কাছে ফুলের বাগান
তাতেই বৃন্দাবন॥

১৮৩

ওরে আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে।
মা বলে বলে ডাকছিলে
ধুলো কাদা কত মাখ্‌ছিলে।
সে যদি তোমার মা হত
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত

১৮৪

ওরে আমার সোনা।
সেক্‌রা ডেকে মোহ্‌র কেটে
গড়িয়ে দেব দানা॥

১৮৫

ওরে আমার সোনামণি
মধুর হাসি হেসো না,
ওই হাসিতে ছড়ায় প্রাণে
কত রঙ্‌, তা জানো না।
তোমার হাসি দেখে রে চাঁদ
আকাশের চাঁদ হাসে,
আমি হাসি আর জগৎ হাসে
হাসির বাজার বসে॥

১৮৬

ওরে ও নটেশাক
তোর দেশে কী এই বিচার?
ইঁদুর বিড়ালে ধরে খায়।
শুন গো মা ভগবতী
ছাগলে গিলেছে হাতি
পুঁটিমাছ তানপুরা বাজায়॥

১৮৭

ও ললিতে চাঁপকলিতে
একটা কথা শুন্‌সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চুড়ো বাঁধা এক মিন্‌সে।

ঘটি নেয় না বাটি নেয় না
নেয় না ফুলের ঝারি,
যে ঘরেতে সোঁদর বউ
সে ঘরেতেই চুরি।
চোরের মাথায় চাঁপা ফুল
ঝর ঝর ঝর ঝরে,
এমন চোর দেখি নি গো
রাধা চুরি করে॥

১৮৮

কচি কচি পেয়ারা পাতা
ও ঠাকুমা যাচ্ছ কোথা?
আমি যাচ্ছি কলকাতা
আনতে সোনার কাজললতা।
ও কী আমি পরতে পারি
দূর হয়ে যা শ্বশুরবাড়ি॥

১৮৯

কট্‌কটেটা বলে আমি
এই গাছেতে আছি।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
জুল্‌পি ধরে নাচি॥

১৯০

কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু।
এখন ভ্যাঁ কর তো বাপু॥

১৯১

কত মুনির মনস্তাপ।
কত কাত্যায়নীর জপ।
কত উপোস মাসে মাসে
তবে ধন এসেছে দেশে॥

১৯২

কত সাধ যায় গো চিতে
বেগুন গাছে আঁকশি দিতে॥

১৯৩

কাক ঝিঁঝি বকুল বিচি
কাকের গলায় শিকল গাছি।
শিকল ধরে দিলাম টান
ঝিঁঝি ভেঙে খান খান॥

১৯৪

কা কা কা কাকের ছানা
ভাত খায় না খোকন ধনা।
কাগা বগা আয় আয়
দেখ্‌সে খোকা ভাত খায়।
লক্ষ্মী আমার পেটের বাছা
চাঁদপানা মুখ
গাল বেয়ে দুধ ঝরে
টুপ্ টাপ্ টুপ্॥

১৯৫

কাজল বলে উজল আমি গৌর মুখে থেকে
হতমান হবে আমার গেলে কালো মুখে॥

১৯৬

কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি
কাপড় কেচে দে।
তোর বিয়েতে নাচতে যাব
ঝুম্‌কো কিনে দে।
ঝুমকোর ভিতর পাকা পান
বিবি হচ্ছে মোছলমান॥

১৯৭

কাদা শাওলার পথ
বাদ্‌লা ভাঙা রথ
মোটা কাপড়ের বাসি
নিদন্তের হাসি
আমি বড়োই ভালবাসি॥

১৯৮

কাঁদুনে রে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদবে বলে মনে করেছ আশা।
হাত ভাঙ্গব পা ভাঙ্গব করব নদী পার
সারারাত কেঁদো না রে যাদু ঘুমোও একবার

১৯৯

কানকাটার মা বুড়ি
বেড়ায় গুড়ি গুড়ি।

এক হাতে নুনের ভাঁড়
আর এক হাতে ছুরি।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
নাকটি কেটে কানটি কেটে
দেয় গড়াগড়ি॥

২০০

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ॥

২০১

কার কি হারিয়েছে।
মদনমোহন পালিয়েছে॥

২০২

কার ধনটি ছেলে
নাচে হেলে দুলে।
হামা দিয়ে আয় রে বাছা
করব তোরে কোলে।
দুধ খেয়ে সোনার যাদু
আবার যেয়ো চলে॥

২০৩

কার বাপধন দিচ্ছে হামা
বলছে মুখে মা মা মা মা।
এ যে দেখি আমার দুলাল
চুমো দাও তো দুটি গাল॥

২০৪

কার্তিক বড় হ্যাংলা।
একবার আসে মায়ের সঙ্গে
একবার আসে একলা

২০৫

কাল আমাকে মেরেছিলে
সয়েছিলাম আমি।
আজ আমাকে মার দেখি
কেমন বট তুমি॥
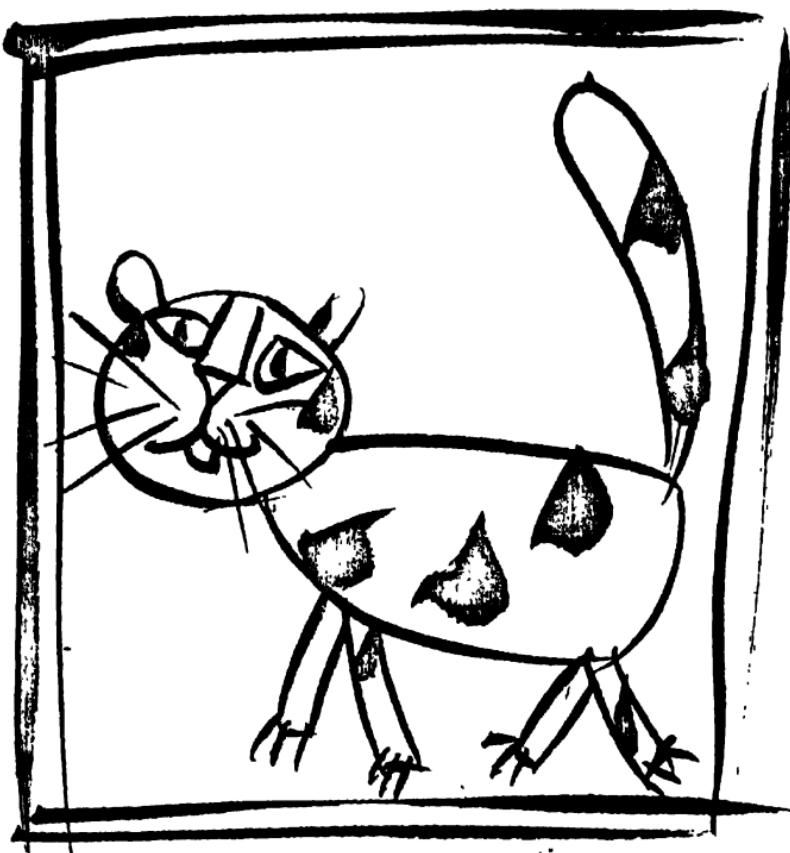
২০৬

কালিয়ে সোনা চাঁদের কোণা
পেয়েছি মনের মত।
না জানি নদীর কূলে
তপ করেছি কত॥

২০৭

কালি ঘোটন কালি ঘোটন
সরস্বতীর পায়।
যার দো'তে ঘন কালি
আমার দো'তে আয়॥

২০৮

কালো নয় আমার কেলে সোনা
জলেতে ঝাঁপ দিয়ো না
হারালে আর পাব না॥

২০৯

কী খাবার মন বাবু কী খাবার মন?
হাটের চুঁচুড়া মাছ বাড়ির বেগন
তাই খেয়ে খোকাবাবুর এতই নাচন।

২১০

কী জন্য কাঁদছ রে খোকা
কী নেই আমার ঘরে।
সোনার তক্তি গড়িয়ে দেব
মুক্তা থরে থরে॥

২১১

কী ধন কী ধন বেনে
কে দিলে তোমায় এনে
তার নাগাল যদি পেতাম,
তোমার মত সোনার চাঁদ
আর গোটা দুই চেতাম॥

২১২

কী রান্না রেঁধেছিস্ পিসি
পাটশাগের ঝোল।
খাঁদা নাকের গড়গড়ানি
পাড়া গণ্ডগোল॥

২১৩

কী লাগি কাঁদে রে বাছা,
কী ধন বা চায়।
আনিয়া দিব গগন-ফুল
একই ফুলের লক্ষ মূল।
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার
সোনার বাছা কেঁদো না আর।
মাখাব কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
রাজার মেয়ে করাব বিয়া॥

২১৪

কীসের জন্যে কাঁদো রে যাদু
কী না দিতে পারি?
ঠোঁট ফুলায়ে কাঁদো রে যাদু
সেই দুঃখে মরি।

কীসের জন্যে কাঁদো রে গোপাল
কী না আছে ঘরে?
সোনার ভাঁটা খেলতে দেব
মুক্তা থরে থরে॥

২১৫

কুকুরে বাজায় টুমটুমি
বানরে বাজায় ঢোল।
টুনটুনিয়ে টুনটুনাল
ইঁদুরে বাজায় খোল।
সাপের মাথায় ব্যাং নাচুনি
চেয়ে দেখ না খোকনমণি॥

২১৬

ব্যাঙ। কুলোকানি মুলোদাঁতি
ডিঙিয়ে গেলি মোরে?
হাতি। থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়ানাকি
ধর্মে রেখেছে তোরে।
(ছুঁচোর কাছে গিয়ে)
ব্যাঙ। গন্ধে ভুর্‌ভুর্ কর্পূরদাস
আমার নাকি থ্যাবড়া নাক?
ছুঁচো। ঘরে যাও রূপে বিদ্যাধরী *
ছার কথা কি ধরাট করি॥

২১৭

কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল
মালদহের ভাল আম।
উলোর ভালো বাঁদর পুরুষ
মুর্শিদাবাদের জাম।

বর্ধমানের চাষি ভালো
চব্বিশ পরগণার গোপ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো
শীঘ্রি বংশ লোপ॥

২১৮

কেঁদো না আর যাদুমণি
আনব তোমার বউ।
সোনা হেন রঙ্‌টি তার
ঠোঁটে আলতাগোলার ঢেউ॥

২১৯

কেঁদো না রে যাদুমণি কাঁদলে গলা ভাঙবে।
রাত পোহালে বাঁশি দেব যত সোনা লাগবে।

২২০

কেঁদো না রে সোনার যাদু
কাঁদলে হবে কী।
যে বকেছে তোমায় তার
গরম ভাতে ঘি॥

২২১

কেঁদো না রে সোনার যাদু
মা গেছে ঘাটে।
খেয়ো এখন সব দুধ
যত পেটে আঁটে॥

২২২

কেউ মরে বিল ছেঁচে
কেউ খায় কই।
যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দই॥

২২৩

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল।
খোকার গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল।

২২৪

কেন যাদু আমার কেঁদেছে
যাদুকে কি কেউ মেরেছে
নয় তো কি কেউ বকেছে
কোথায় যাদু খেলছিলে
কে দিয়েছে কান মলে?

২২৫

কে বকেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল।
তাই তো খোকা রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল।
কে বকেছে কে মেরেছে দুধের গতরে?
আধ সের চাল দেব তার গালের ভিতরে॥

২২৬

কে বলেছে মন্দ কে দিয়েছে গাল
কীসের তরে কাঁদে আমার ননির গোপাল।
খোকন কেন কাঁদে?
খোকার মা রাঁধে।

ও খোকার মা, ঘরে এসো গো।
তোমার তরে কেঁদে কেঁদে খোকা সারা হল গো।

২২৭

কে বলে রে আমার গোপাল বোঁচা
সুখ সাগরের মাটি এনে নাক করিব সোজা।
কে বলে রে আমার গোপাল কালো
পাটনা থেকে হলুদ এনে দেশ করিব আলো।
কে বলে রে আমার গোপাল ন্যাড়া
বাঁশনি বাঁশের ঝাড় কেটে গড়িয়ে দেব আড়া॥

২২৮

কে বলে রে খাঁদা
খাঁদায় মন বাঁধা।
আমার খাঁদা নয়ত কী
খাঁদা নাকে নোলক গড়িয়ে দি॥

২২৯

কে মেরেছে কে ধরেছে সোনার গতরে
আধ কাঠা চাল দেব গালের ভিতরে।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাওনি কাল।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে কোঁদল করে আসব আমি কাল।
মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর্
সবে মাত্র বলেছি, গোপাল চরাও গে বাছুর॥

২৩০

কে রে কে রে কে রে!
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দে রে॥

২৩১

কৈ গেছিলা? শিশির পাড়া।
কি দেখিলা কি শুনিলা?
মানুষের মাথা গোরুর মাথা
ধোপাবাড়ির ছাই।
আজ অবধি বাছার আমার
কান্দাকাটি নাই॥

২৩২

কোথা গেছ্‌লে রে চাঁদমণি।
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে
চিবিয়ে মলাম আমি॥

২৩৩

কোথায় আমার চাঁদমণি
মুচ্‌কি হাসি মুখখানি।
ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা
গাল ভরে দিই হাজার চুমা॥

২৩৪

কোড়াল বলে কোড়ালি এবার বড়ো বান
উঁচু করে বাঁধো ভিটে খুঁটে খাব ধান।

ধান খাব না পান খাব না খাব যবের নাড়ু
দুই হাত ভরিয়ে দেব সুবর্ণের খাড়ু।
সুবর্ণের খাড়ু না রে—এ যে দেখি রাঙ্
কোথা যেয়ে পাব আমি পদ্মাবতীর গাঙ।
পদ্মাবতীর গাঙ দিয়ে সাধুর নাও চলে
আড়াই কুড়ি ডিম লয়ে কোড়াল ডাক ছাড়ে।

২৩৫

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি
ঘরে বসে পুছে বাত
তার ঘরে হা-ভাত যো-ভাত॥

২৩৬

খাঁদা নাক পরলের চাক
নাক উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক।
হ্যাঁ দেখে যা কনের বাপ
কোন্‌খানটা খাঁদা নাক?
খাঁদা কি বলতে দেব
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেব॥

২৩৭

খাঁদা নাক পরলের চাক
নাক উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক।
নাক ওঠে নাক ওঠে
ওঠে ধানের শিষ,
নাক ওঠে নাক ওঠে
পিদিমের শিষ।

নাক ওঠে নাক ওঠে
ওঠে পানের ঠোঁট।
যাদুর নাকটা ওঠ্॥

২৩৮

খাঁদা বোঁচ্‌কা বাঁধা
গোরু চরাতে যায়।
কোপ্‌নি বাঁধা দিয়ে খাঁদা
মণ্ডা কিনে খায়॥

২৩৯

খায় দায় পাখিটি।
বনের দিকে আঁখিটি॥

২৪০

খিদেয় গোপাল কাঁদে
দে গো মা তুই নবনী,
কেঁদো না কেঁদো না বাপ
কোলে এসো আপনি।
তুমি আমার ধন
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন॥

২৪১

খুকি যাবে শ্বশুরবাড়ি খেয়ে যাবে কি?
শিকের উপর গরম রুটি মেনা গাইয়ের ঘি।
তোমরা একটু বিলম্ব করো দুধ আউটে দি।
দুধে পড়েছে মাছি
আমার খোকা খেয়েছে চাঁছি।

খুকির সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে কেলো কুকুর সঙ্গে সেজেছে।

২৪২

খুকু এসেছে বেড়িয়ে
পায়ের ঘুঙুর হারিয়ে।
গেছে গেছে হারিয়ে
আবার দেব গড়িয়ে
দুধ আন গো জুড়িয়ে॥

২৪৩

খুকুনবালা টাকার ছালা
মট্‌কি ভরা ঘি।
খুকুর ভাতে ভোজ হল না
ছি-ছি-ছি!

২৪৪

খুকুমণি দুধের ফেনি
কৌ গাছের মৌ।
সব ছেলেদের বলব খুকুন
হাঁড়িখাকির বৌ॥

পাঠান্তর ঃ
খুকুমণি দুধের ফেনি
কদম গাছের মৌ।
হাড় ডুগ্‌ডুগানি উঠান ঝাড়ুনি
মণ্ডা খাবার বৌ॥

২৪৫

খুকু বড়ো সেয়ানা
খেলে নিয়ে খেলানা।
হাসে কাঁদে এক সাথ
পড়ে যায় চিৎপাত॥

২৪৬

খুকু বলতে পারে কইতে পারে
সইতে পারে না।
খেতে পারে নিতে পারে
দিতে পারে না॥

২৪৭

খুকুমণির বিয়ে কাল
আধসের মুসুরের ডাল
বর খাবে বরযাত্রী খাবে
পাড়াপড়শি এলে পাবে
নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে॥

২৪৮

খুকুরানির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে
হিরেয় দাঁত ঘসে
টাকায় পা মোছে।
রুইমাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে।
তার মা কোণে বসে বসে বাছে।
পাড়া পড়শি চাইতে এলে বলে—
আর কি আমাদের আছে॥

২৪৯

খুকু যাবে খেলা করতে　　সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে ময়রা বুড়ো　　তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে চান করতে　　সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে ময়না দিদি　　তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি　　সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কালাচাঁদ　　তাকে পাঠিয়ে দে॥

২৫০

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ি　　সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে হুলোবিড়াল　　কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব　　ছায়ায় ছায়ায় যেতে
শান-বাঁধানো ঘাট দেব　　পথে জল খেতে।
ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে দেব　　আলোয় আলোয় যেতে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব　　শাশুড়ি ভুলাতে।
শাশুড়ি ননদ বলবে দেখে　　বউ হয়েছে কালো
শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে　　ঘর করেছে আলো॥

২৫১

খুরোর উপর খাটখানি
তার উপর যাদুমণি।
যাদুমণি খেলা করে
গাল বেয়ে লাল ঝরে॥

২৫২

খুঁজে খুঁজে নারি।
যে পায় তারি॥

২৫৩

খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং।
কার বাড়িতে গেছ্লি খোঁড়া
কে ভেঙেছে ঠ্যাঙ্?
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং॥

২৫৪

খোকন আমাদের ধন ছেলে
কাঁদতে জানে না।
ঘুম পাড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে
জেগে থাকে না।
খাবার দিলে খেয়ে ফেলে
ছড়িয়ে ফেলে না।
বই দিলে পড়ে ফেলে
ছিঁড়ে ফেলে না॥

২৫৫

খোকন আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্ছিলে
মা বলে বলে ডাকছিলে
গায়ে ধুলো কত মাখছিলে।
ষষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ।
আর বার দুই যাব
আর গোটা চার আনব॥

২৫৬

খোকন আমার সোনা।
কোন্ পুকুরে মাছ ধরেছে
শুধুই ডান্‌কোনা॥

২৫৭

খোকন খোকন করে মায়
খোকন গেল কাদের নায়।
সাতটা কাকে দাঁড় বায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়॥

২৫৮

খোকন খোকন গন্ধ হয়।
খোকন ছুঁলে নাইতে হয়॥

২৫৯

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন গেছে কার বাড়ি।
আয়রে খোকন ঘরে আয়
দুধমাখা ভাত কাকে খায়॥

পাঠান্তরঃ
তোর দুধমাখা ভাত বেড়ালে খায়
তোর গুড়মাখা মুড়ি মাছিতে খায়

২৬০

খোকন খোকন পায়রাটি
কোন্ বিলেতে চরে।

খোকন বলে ডাকলে পরে
মা-র কোলেতে পড়ে॥

২৬১

খোকন গেছে কোন্‌খানে?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে খোকন কি করে?
ডুব দেয় আর মাছ ধরে॥

পাঠান্তর ঃ
খোকা গেছে কোন্‌খানে?
শাল পিয়ালের বনখানে।
সেখানে খোকা কি করে?
থোকা থোকা ফুল পাড়ে॥

২৬২

খোকন গেছে কোন্ পাড়া
ভাত হয়েছে কড়কড়া
ব্যান্নন হল বাসি
খোকন আজকে উপবাসী॥

২৬৩

খোকনমণি বড় হয়ে
বসবে সিংহাসনে,
কত অন্ধ আতুর বেঁচে যাবে
খোকনমণির দানে।
খোকন, মায়ের কথা ভুলো না
পাপ কর্ম কোরো না॥

২৬৪

খোকনমণি ভাঁড়ের ননি
নাম রেখেছে মায়।
সদাই খোকন বিরস বদন
মণ্ডা খেতে চায়॥

২৬৫

খোকনমণি হারা
যাস্ নে গোয়াল পাড়া।
হাতের বাঁশি কেড়ে নিয়ে
বলবে মাখন চোরা॥

২৬৬

খোকন মোহন চৌধুরী
বউটি হবে সুন্দরী।
একটু ন্যাকা হাবা
রেঁধে বেড়ে ডাকবে খোকায়
ভাত খাও সে বাবা॥

২৬৭

খোকন যাবে নায়ে
গুজ্রি ঘুঙুর পায়ে।
পাঁচশ টাকার জামাজোড়া
খোকন ধনের গায়ে।
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে
খোকন রাজার পায়ে॥

২৬৮

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
খেয়ে যাবে কি?
ঘরে আছে গমের ময়দা
শিকেয় আছে ঘি।
একটুখানি দাঁড়া খোকন
লুচি ভেজে দি।

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
খেয়ে যাবে কী?
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি
মেনা গাইয়ের ঘি॥

২৬৯

খোকন শোবে ঘরে
ঘর ঝক্‌ঝক্ করে।
সোনার সিঁথি গড়িয়ে দেব
মুক্তা থরে থরে॥

২৭০

খোকন সোনা চাঁদের কণা
একরত্তি ছেলে।
আর কিছু ধন চায় না খোকন
মায়ের কোলটি পেলে॥

২৭১

খোকনের মা ঘরে নাই
শুয়ে ঘুম যায়।
মাচার নিচে শুয়ে খোকন
আঙুল চুষে খায়॥

২৭২

খোকা আমাদের কই
জলে ভাসে খই।
শুকোল বাটার পান
অম্বল হল দই॥

২৭৩

খোকা আমার ঘুম না যায়
মিটিমিটি চক্ষু চায়।
ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি
ঘুম দিলে ভালবাসি॥

২৭৪

খোকা আমার নক্‌খি!
গলায় দেব তক্‌তি,
কোমরে দেব হেলে,
খোকা চলেছে যেন—
সদাগরের ছেলে॥

২৭৫

খোকা আমার বাবু
ছোড়ায় চড়ে যাবু
ডুগ্‌ডুগি বাজাবু
এক খিলি পানের তরে
বউ বাঁধা দিবু॥

২৭৬

খোকা আমার বেড়ায় হাসিমুখ।
ও হাসি যে হেরে, সে—
ভুলে সকল দুখ॥

২৭৭

খোকা আমার ভাত খাবে কি দিয়ে?
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ
বাড়ির বেগুন দিয়ে॥

২৭৮

খোকা আমার সোনা
চার পুকুরের কোণা।
বাড়িতে স্যাক্‌রা ডেকে মোহ্‌র কেটে
গড়িয়ে দেব দানা
তোমরা কেউ কোরো না মানা।
খোকা আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেব তক্তি
কাঁকালে দেব হেলে।
পাক দিয়ে দিয়ে বেড়াবে
বড় মান্‌ষের ছেলে॥

২৭৯

খোকা এল কই?
ভেজে রেখেছি খই।
গরম দুধ সবরি কলা
খোকা খাবে বিকেল বেলা॥

২৮০

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে।
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত॥

২৮১

খোকা খোকা ডাক পাড়ি
খোকা গিয়েছে কার বাড়ি
আন্‌গো তোরা লাল ছড়ি
খোকাকে মেরে খুন করি॥

২৮২

খোকো খোকো ডাক পাড়ি
খোকো বলে, মা শাক তুলি।
মরুক মরুক শাক তোলা
খোকো খাবে দুধ কলা॥

২৮৩

খোকা গেছে মাছ ধরতে
হলদি গুড়ির মাঠে।
খোকার গায়ে কাদা দেখে
আমার বুকটা ফাটে॥

২৮৪

খোকা গেছে মাছ ধরতে
দেবতা এল জল।
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি
খোকন আসুক ঘর।
কাজ নাইকো মাছে
আগুন লাগুক মাছে
খোকনের গায়ে কাদা লাগে পাছে॥

২৮৫

খোকা গেল মাছ ধরতে
ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙ্
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে পাখিটি
কোন্ বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে॥

২৮৬

খোকা ঘুমাবে দিব দান
　　　　　পাব ফুলের ডালি।
কোন্ ঘাটেতে ফুল তুলেছে
　　　　　ওরে বনমালী।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে
　　　　　তুলে ধর ডালি।
খোকা আমাদের ধন
বাড়িতে নটের বন
বাহির বাড়ি ঘর করেছি
　　　　　সোনার সিংহাসন॥

২৮৭

খোকা ঘুমো ঘুমো।
তালতলাতে বাঘ ডাকছে
দারুণ হুমো।

২৮৮

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়ুল
বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে?
ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনা দেব কী?
আর কটা দিন সবুর কর
সরষে বুনেছি॥

২৮৯

খোকা নাচে কোন্‌খানে?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে খোকা চুল ঝাড়ে
থোকা থোকা ফুল পাড়ে
তাই নিয়ে খোকা খেলা করে।

২৯০

খোকা নাচে গায়,
খুদ কুঁড়াটি পায়।
খোকার মা আদুরি
নিত্য পিঠে খায়।
একটুখানি পিঠের তরে
খোকারে কাঁদায়।

২৯১

খোকা নাচে নায়ের কাছে
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
ওরে বোয়াল ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা॥

২৯২

খোকা বড়ো ভালো
আরো দুধ ঢালো।
দিয়ো না খোকা যন্ত্রণা
দুধ খেতে আর কেঁদো না॥

২৯৩

খোকাবাবু দোলে
চুষিকাঠি কোলে
লালুবাবু গালে
আসে আর ঝোলে॥

২৯৪

খোকামণি কই? খাটে শুয়ে ওই।
চিনির পাকে মণ্ডা রাখে
গামছা বাঁধা দই।
আমার সোনার খোকা কই॥

২৯৫

খোকা যাবে নায়ে
রোদ লাগিয়ে গায়ে,
লক্ষ টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে।
তাতে নাল গোলাপের ফুল
যত বাঙ্গালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি
একটু বিলম্ব কর, খোকাকে লুচি ভেজে দি।

২৯৬

খোকা যাবে পাঠশালে
পাততাড়ি বগলে।
লেখাপড়া অষ্টরম্ভা
ফটর্ ফটর্ বলে।
খোকার লম্বা কোঁচা দোলে॥

২৯৭

খোকা যাবে বিয়ে কত্তে হস্তীরাজার দেশে
তারা রুপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে বসে।
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে।
খোকামণিকে সোহাগ করে যোতুক দেবে কী?
শাল দিবে দোশালা দিবে রূপবতী ঝি॥

২৯৮

খোকা যাবে বেড়াতে
দুধ দাও গো জুড়াতে।
তাতে দাও মণ্ডা ফেলে
খোকা খাবে তুলে তুলে॥

২৯৯

খোকা যাবে বেড়ু কত্তে গয়লানিদের পাড়া
গয়লানিরা মুখ করেছে, কেন রে মাখনচোরা।
ভাঁড় ভেঙেছে ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে লুব॥

৩০০

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি কি দিয়ে ভাত খেয়ে?
নাদনঘাটের পাট-টাংরা নদের বেগুন দিয়ে।
খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে নিবে কী?
বড়ো বড়ো ফুলবাতাসা কলসিভরা ঘি।
শিউলি ফুলের মালা গেঁথে পরবে খোকা গলে
লাল জুতা পায়ে দিয়ে নাচবে তালে তালে॥

৩০১

খোকার আমার নিদন্তের হাসি
আমি বড়ই ভালবাসি।

৩০২

খোকার চুল ঝাঁকড়া
ধরতে গেল কাঁকড়া।
ফেলেছে খোকা জাল।
রোদ্দুরেতে সোনার বরণ
হয়ে উঠেছে লাল।
ঘরে এস যাদুধন
দুধু জুড়ুল অনেকক্ষণ॥

৩০৩

খোকা যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে,
পাঁচশো টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো॥

পাঠান্তর ঃ
খোকা যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে,
লক্ষ টাকার মলমলি থান
সোনার চাদর গায়ে।
বুকে লাল গোলাপের ফুল
খোকা যাবে নদীর কূল।

সায়দাবাদের ময়দা মুঙ্গেরের ঘি
একটু বিলম্ব কর, লুচি ভেজে দি।
খোকা যাবে নায়ে
রোদ লাগিবে গায়ে।
লোকে বলবে কালো।
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো॥

৩০৪

খোকা যাবে মাছ ধরতে
খেয়ে যাবে কী?
শিকেয় তোলা গরম লুচি
কলসিভরা ঘি।
খোকা যাবে মাছ ধরতে
হীরে নদীর বিল।
মাথায় গুগলির ঝুড়ি
সঙ্গে দুটো চিল॥

৩০৫

খোকা যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীর নদীর বিল
মাছ নয় গুগুলির পিছে উড়ছে দুটো চিল।
খোকা যাবে মাছ ধরিতে গায়ে লাগিবে কাদা
কলুবাড়ি গিয়ে তেল নেও গে দাম দেবে তোমার দাদা।

৩০৬

খোকা যাবে রথে চড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি।
মাটির পুতুল লটর পটর
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।

ছাতির উপর কোম্পানি
কোন্ সাহেবের ধন তুমি॥

৩০৭

খোকা হবে নায়েব
দেখবে কত সাহেব।
খোকার পুজোয় হবে ধুম্।
সোনার খাটে শোবে যাদু
আয়রে যাদুর ঘুম॥

৩০৮

গগনে পেতেছি ফাঁদ
আমি ধরে দেব পূর্ণ চাঁদ।
চাঁদ দেব চাঁদের মালা দেব
চাঁদের গাছে গোপাল চড়িয়ে দেব।
কাঁদো কেন চাঁদের তরে
সোনার চাঁদ আমাদের ঘরে॥

৩০৯

গঙ্গাজলে বিল্বদলে
জপ করেছি কত,
তাই তো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মতো।
ধনকে নিয়ে বনকে যাব
আর করব কী—
বিরলে বসিয়ে ধনের মুখ নিরখি॥

৩১০

গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই
আমরা দু'ভাই গাজন গাই।
গাজন গানে তেলাভোলা মাঠ
গাইতে গাইতে গলা হল কাঠ॥

৩১১

গড়গড়ের মা গড়গড়ি লো
তোর গড়গড়েটা কই?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে
পিঁপড়ে টানে মই॥

৩১২

গণেশের মা, কলাবউকে
জ্বালা দিয়ো না।
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা॥

৩১৩

গাঙ্ পারে ঢিল ছুঁড়ি
চাল কুটে ধব্‌লি গুঁড়ি
ধব্‌লি গুঁড়ি চালের পাক
যেমন পিঠে তেমন থাক্।
কার আজ্ঞে
রঙ্কিলা দেবীর আজ্ঞে॥

৩১৪

গালফুলো গোবিন্দর মা
চালতাতলায় যেয়ো না।
চালতাতলায় গোরুর ঠ্যাং
কল্‌কে নাচে ড্যাডাং ড্যাং॥

৩১৫

গাঁথি শালশোল শালিকের নাতি
ভাঙবে রাম লাথি মেরে ছাতি।
যা যা বাছাকে তুই ছেড়ে যা
সাত সায়রের জল কুতকুতিয়ে খা

৩১৬

গিন্নি ভেঙেছে নাদা
ও কিছু নয় দাদা।
ঝি ভেঙেছে কাঁসি।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসি।
বৌ ভেঙেছে সরা
তা পাড়ায় বলে বেড়া।
বড়ো সরাটি ভেঙেছে বৌ
ছোটো সরাটি আছে।
লপর চপর করিস্‌ কি লা
হাতের আটকল আছে॥

৩১৭

গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে?
খল্‌সে।
দে মুখ ঝল্‌সে।

গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে?
পুঁটি।
ধর্ চুলের মুটি।
গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে?
ট্যাংরা।
মার্ কসে খ্যাংরা॥

৩১৮

গুঁতি রে গুঁতি
তোর ঠাকুর কোথা শুতি?
খাটে পালঙ্ক সিংহাসন
ওই শুয়ে যে নারায়ণ॥

৩১৯

গুড় সাহেবের লম্বা ঠ্যাং
তার নিচে ঈশ্বর ব্যাং
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা
তার নিচে গুপে কানা॥

৩২০

গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়োর বে
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।
গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়ো হাজির
এক দণ্ড সবুর করো জল খেয়ে আসি॥

৩২১

গুরুমশায় গুরুমশায় মেরো না ছড়ি
পান্তাভাত খেতে আমার হয়ে গেছে দেরি।

আম খেয়ো জাম খেয়ো তেঁতুল খেয়ো না
তেঁতুল খেলে জিব ঝরবে ছেলে জুটবে না।
আঙ্ক আস্ক সিদ্ধি ফলা
বাড়ি আমার সেই তেঁতুলতলা।
যদি গুরুমশায় মাইনে নেয়
কোন্ ছেলে বা লিখতে চায়॥

৩২২

গেরস্থ ভাই দেবে আগুন?
গড়ব কাঁচি কাটব ঘাস
খাবে গাভী দেবে দুধ
খাবে হরিণ করবে যুধ
ভাঙবে শিং খুঁড়ব মাটি
গড়ব ভাঁড় আনব জল
ধোব হাত
তবে আমি চড়াব ভাত॥

৩২৩

গোকুল গোকুলে বাস
গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস
আমার যেন হয় স্বগ্‌গেতে বাস॥

৩২৪

গোদা নাটাটা পা ফাটাটা
অড়ল বনের ধারে
যে কাঁদে তার কানটি কেটে
নুনের ভাঁড়ে পোরে।

এক হাতে তার নুনের ভাঁড়
এক হাতে তার ছুরি
কুচুৎ করে কানটি কেটে
নুনের ভাঁড়ে পুরি॥

৩২৫

গোপাল আমার ধীর
খেতে দেব ক্ষীর।
গোপাল আমাদের ঠাণ্ডা
খেতে দেব মণ্ডা।
কোমরে দেবে হেলে
ঘরে ঘরে খেলবে গোপাল
লক্ষ টাকার ছেলে॥

৩২৬

গোপাল আমার বাপের ঠাকুর
কনক রাজার জাতি
তোরে খেলতে দেব আদর করে
নয় লক্ষ হাতি।
হাতি দেব হাওদা দেব
ঝালর দেব তায়
আয়রে আমার সোনার যাদু
মায়ের বুকে আয়॥

৩২৭

গোপাল গোপাল গোপাল
কাঙালিনির দুলাল।
তুমি আমার যোগীর কোশাকুশি
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশি।

ধন বর্ষাকালের ছাতি
আঁধার ঘরের বাতি
ছেলের হাতের নাড়ু
পোয়াতির হাতের খাড়ু
কানার হাতের লাটি
শীতকালের মাটি॥

৩২৮

গোপাল বেড়ায় রে অলিগলি
ছাতা ধর রে বনমালী।
ছাতার ভেতর কোম্পানি
কোন্ কাঙালের ধন তুমি॥

৩২৯

গোয়ালের শোভা নেয়াল বাছুর
গানের শোভা চাঁদে।
কোলের শোভা খোকন আমার
মেঝেয় পড়ে কাঁদে॥

৩৩০

গাড্ মানে ঈশ্বর, লার্ড মানে ঈশ্বর, কাম মানে এসো,
ফাদার বাপ মাদার মা সিট মানে বোসো।
ব্রাদার ভাই সিস্টার বোন ফাদার-সিস্টার পিসি,
ফাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর মাদার-সিস্টার মাসি।
আই মানে আমি আর ইউ মানে তুমি
আস্ মানে আমাদিগের, গ্রাউন্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন আর নাইট মানে রাত
উইক্‌কে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত।

ফিলজফার বিজ্ঞলোক, প্রোমেন চাযা।
পম্‌কিন লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার শশা॥

৩৩১

ঘর কেন আলো? সবাই আছে ভালো।
দুয়োরে কেন হাতা? গিন্নি বড় দাতা।
দুয়োরে কেন ঝাঁটা? সবাই লোহার কাঁটা॥

৩৩২

ঘর পোড়ে, বৃক্ষ মরে, মানুষ নাই বাড়িতে।
আগুন গেল তীর্থ করতে, চুলা মরে শীতে॥

৩৩৩

ঘু ঘু ঘু পেটে ফুঁ।
কী ছেলে হল? বেটা ছেলে।
কোথায় গেল? মাছ ধরতে।
মাছ কই? চিলে নিলে।
চিল কই? ডালে বসল।
ডাল কই? পুড়ে গেল।
ছাই মাটি কই? উড়ে গেল।
কলসি গেল ভেসে
খোকার বৌ ম'ল হেসে॥

৩৩৪

ঘু ঘু সই, পুত কই?
কী ছেলে? বেটা ছেলে।
কোথায় গেছে? মাছ ধরতে।
কী মাছ? সরল পুঁটি।

মাছ কই?　　চিলে নিয়েছে।
চিল কই?　　ডালে বসেছে।
ডাল কই?　　ছুতোরে কেটেছে।
ছুতোর কই?　　নৌকো গড়েছে।
নৌকো কই?　　জলে ডুবেছে।
জল কই?　　কাদা হয়ে গেছে।
বালি কই?　　লোকে খই ভেজে খেয়েছে।

৩৩৫

ঘুম আয়রে ঘুম আয় রে
দোব ছানা ননি।
ঘুম যায় রে ঘুম যায় রে
সোনার যাদুমণি।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে
দোব মিঠাই খেতে,
খুকুর চোখে ঘুম আয় রে
সোনার পিঁড়ি পেতে॥

৩৩৬

ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে
সোনার যাদুমণি
দোব ছানা ননি।
আসবি যদি মণির চোখে
কত ভালোবাসব তোকে
হিরের বালা মুক্তোর মালা
করব কত দান।
বাটি ভরে দুধ খাওয়াব
বাটা ভরে পান॥

৩৩৭

ঘুম আয়রে সোনার মণি ঘুমাও আবার
আবার ঘুমালে দেব সোনার মণিহার।
হাতে দেব তারের বালা, মুখে দেব বাঁশি।
মথুরা নগরে যেতে সঙ্গে দেব দাসী॥

৩৩৮

ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমচি গাছের পাতা।
রাজার দুয়ারে ঘুম যায় রে কাটা দুটো মাথা।
গেরস্তের দুয়ারে ঘুম যায় রে বেটুয়া কুকুর।
আমাদের দুয়ারে ঘুম যায় রে লক্ষ্মীনারায়ণ দুটি ঠাকুর।

৩৩৯

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতি ঘোড়া।
ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর
খাট পালঙ্কে ঘুম যায় ষষ্ঠীঠাকুর।
আমার কোলে ঘুম যায় খোকামণি॥

৩৪০

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি যেয়ো
শান্তিসুখের নিদ্রা আমার ধনমণিকে দিয়ো।
কোথায় পাব এমন নিদ্রা আমি কাঙালিনী
দয়া করে দেবেন নিদ্রা প্রাণ দিয়েছেন যিনি।
মাতার মাতা পরম মাতা যিনি সবাকার
যত বৃদ্ধ যত শিশু সব ছেলে তার।
সবাইকে ঘুম পাড়ান তিনি হাত বুলিয়ে গায়
গায়ের ব্যথা মনের ক্লেশ সব দূর হয়ে যায়॥

৩৪১

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি এসো
খাট নেই পালঙ্ক নেই খোকার চোখে বোসো।
খোকার মা বাড়ি নেই শুয়ে ঘুম যেয়ো।
মাচার নিচে দুধ আছে টেনে টুনে খেয়ো।
নিশীর কাপড় খসিয়ে দেব বাঘের নাচন চেয়ো
বাটা ভরে পান দেব দুয়োরে বসে খেয়ো
খিড়কি দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেয়ো॥
পাঠান্তর ঃ
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বোসো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

৩৪২

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো
জলপিঁড়ি দেব তোমায় পা ধুয়ে বোসো।
চাল-কড়াই ভাজা দেব যত খেতে চাও।
দাঁত না থাকে গুঁড়িয়ে দেব কষ্ট নাহি পাও।
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো
যত ছেলের চোখের ঘুম খোকার চোখে দিয়ো।

৩৪৩

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমায় লতাপাতা
দু-দুয়ারে ঘুম যায় দুটি মোগল পাতা।
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুধের কুমারী॥

৩৪৪

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেশম মেখে নেয়ো
শীতলপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে
দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই॥

৩৪৫

ঘুমপাড়ানে মাসি পিসি
ঘুম দিলে ভালোবাসি।
এমন ঘুম দিবে যেন
কেটে যায় নিশি॥

৩৪৬

ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি
ঘুম দিলে ভালোবাসি।
ঘুম যা লো তরুলতা
ঘুম যা লো গাছের পাতা।
ঘুম যা লো নাগরি
কোমরে দেব ঘাগরি।
গলায় রুপোর কাটি
খুকুমণি ঘুম যায় পেতে শীতলপাটি॥

৩৪৭

ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া
দুই ঠ্যাং তোর খোঁড়া।
মারব চাবুক যেই
নাচ্‌বি ধেই ধেই॥

৩৪৮

চড়ুইটি রে মরুইটি রে
দুয়োরে বোসো সে।
রামচন্দ্রের কান ফোঁড়াব
নাড়ু বিলাও সে॥

৩৪৯

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে
জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফার্সি পড়ে তাঁতি॥

৩৫০

চাঁচি মুছি খায় যে
রাজার জামাই হয় সে॥

৩৫১

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে?
আমি তোদের বাবার ঠাকুর
তামাক সেজে দে রে।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে?
আমি তো বটি কেষ্ট ঠাকুর
ঘোমটা টেনে দে রে॥

৩৫২

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে॥

৩৫৩

চাঁদ কোথা পাব বাছা যাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়িয়ে দেব
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব
তুই চাঁদের শিরোমণি
ঘুমো রে আমার খোকামণি॥

৩৫৪

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী।
ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ
চাঁদে মেশামেশি॥

৩৫৫

চাঁদ ছেলে গেছে মাছ ধরতে
ভাংলো নদীর বিল
মাথায় গুগলির ঝুড়ি সঙ্গে দুটো চিল।
আগুন লাগুক মাছে
সোনার চরণে আমার কাদা লাগে পাছে॥

৩৫৬

চাঁদের বাজারে গিয়ে শোল মাছের পোনা।
চাঁদ বদনে চুমো খেতে ভাঙিল থোপনা॥

৩৫৭

চাক্কু লাটা — পানের বাটা
চাক্কু দুই — তুলে থুই
চাক্কু তিন — ঘোড়ার ডিম
চাক্কু চার — পগার পার
চাক্কু পাঁচ — ধিন্‌তা নাচ
চাক্কু ছয় — খুকুর জয়
চাক্কু সাত — কুপো কাৎ
চাক্কু আট — গড়ের মাঠ
চাক্কু নয় — বাঘের ভয়
চাক্কু দশ — খেজুর রস
চাক্কু এগারো — ফসকা গেরো
চাক্কু বারো — কিস্তি মারো॥

৩৫৮

চান্দের মা বুড়ি
খায় গোটা দুই মুড়ি॥

৩৫৯

চারিচোকোর মা নরুনদাঁতি
তেঁতুল গাছে থাকে।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
ঘাড়ে ধরে নাচে॥

৩৬০

চাল গোটা দুই রাঁধ গো সখি
ভাত গোটা দুই খাই
কড়ির চুবড়ি মাথায় দিয়ে
ছুতোর বাড়ি যাই।
ছুতোর ভাই ছুতোর ভাই
ঘরে আছো হে
আমার তোষ্‌লা স্বাদ খাবে
ভালো চিঁড়ে চাই॥

৩৬১

চালতা তলায় আছে হুমো
গাল ধরে ধরে খাবে চুমো॥

৩৬২

চালতা তলায় হাঁটু পানি
ঝিঁঝির মায়ের কান ফোঁড়ানি।
ঝিঁঝি তুই বাড়ি আয়
তোরে রেখে তোর মা
কড়াই ভাজা খায়।
খাবি তো আয়
পচে যায় লো ঝিঁঝি গলে যায়।

৩৬৩

চিঁড়ে বল মুড়ি বল
ভাতের বাড়া নাই।
পিসি বল মাসি বল
মায়ের বাড়া নাই।
কিসের মাসি কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন,
মরা গাছে ফুল ফুটেছে
মা বড় ধন॥

৩৬৪

চেঙা খেতে ঝেঙা ফুল।
ছেঙ্‌ ছেঙাইয়া রোদ তোল্‌
রোদ বেটা রাজা
মানুষ করে তাজা।
আগুন বেটা কুঁইড়া
মানুষ দেয় না ছাইড়া॥

৩৬৫

চেয়ার বেঞ্চির গাছে রে ভাই
লাল টুকটুক টিয়া
বসে আছে মৌরিফুলের
ছাতি মাথায় দিয়া॥

৩৬৬

চোপ্‌ বাঙালি কুছ কাঙালি
নদেয় আমার বাড়ি।
বড় বাজারের পেয়াদাগুলো
গুলে খেতে পারি॥

৩৬৭

চোর হয়ে বাড়ি যায়
ব্যাঙ পুড়িয়ে ভাত খায়।
সেই ব্যাঙ্টা পচল
পান্তা ভাতে মজল॥

৩৬৮

চৌধুরী বাড়ির মৌধুরি পিঠা
গোয়াল বাড়ির দই
সকল চৌধুরী খেতে বসেছে
বুড়া চৌধুরী কই?
বুড়া চৌধুরী গাই দুয়ায়
গাইয়ে দিল লাথ্
সকল চৌধুরী মইরা গেল
শনিবারের রাত॥

৩৬৯

চ্যাং মাছ চচ্চড়ি
তায় পড়ল ফুলবড়ি।
ফুলবড়িটি চুঁয়ে গেল
সেই ফুলটি রয়ে গেল।

৩৭০

চ্যাঁক্ চোঁ ছ্যাক্ ছোঁ
দুধে ভরিল হাঁড়ি।
সব দুধ পাঠিয়ে দেব
খোকার শ্বশুর বাড়ি॥

৩৭১

ছিঁচ্‌কাঁদুনে নাকে ঘা।
রক্ত পড়ে, চেটে খা॥

৩৭২

ছি ছি রানি রাঁধতে শেখে নি।
শুক্তুনিতে ঝাল দিয়েছে
অম্বলেতে ঘি।
রানি রাঁধতে শেখে নি॥

৩৭৩

ছোটো বড়ো কার্তিক গো
মোদের বাড়ি আইয়ো।
খাটের উপর জলপাই থুইছি
নুন দিয়া নুন দিয়া খাইয়ো॥

৩৭৪

জয় প্রভুলাল কি।
হাতি ঘোড়া পাল্‌কি॥

৩৭৫

জষ্ঠি মাসে ষষ্ঠী পূজা করেন যত নারী
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা লোক সারি সারি।
শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা দুধ কলার বাটি
ভাদ্র মাসে তাল পিঠা চাউল কোটাকুটি।
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজায় পাঠ চণ্ডী পুঁথি
কার্তিক মাসে ভাইফোঁটায় পরে নতুন ধুতি।
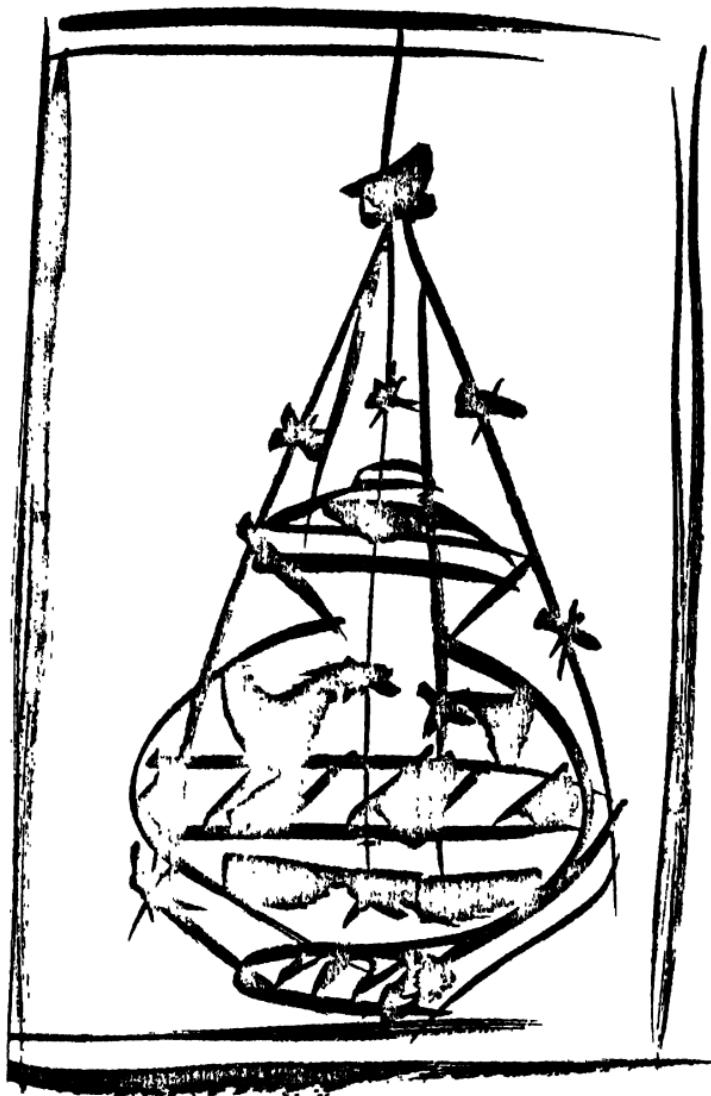
অঘ্রাণ মাসে নবান্ন নতুন চাউলের ভাত
পৌষ মাসে পৌষপার্বণ পিঠা খেতে স্বাদ।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি
ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমা ফাগ ছড়াছড়ি
চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজায় ধুমধাম বেশ
বৈশাখ মাসে বছর আরম্ভ চৈত্রেতে শেষ॥

৩৭৬

জাঁতির উপর জাঁতি।
সাত দিব্যি কাটি॥

৩৭৭

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো কন্যে, তোমার মাথার কেশ।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার ধলো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ।

জাদু, এ তো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার রাঙা দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল,
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ,
চার মিষ্টি দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।

চিনি মিষ্টি, ফেনি মিষ্টি, মিষ্টি ছেলের বোল।
তাহার অধিক মিষ্টি, কন্যে, তোমার কোল।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল,
তাহার অধিক তিতো কন্যে, বোন-সতিনের ঘর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ,
চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি,
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।

৩৭৮

ঝড় ঝড় ঝড়
একটি আম পড়্।
একটি আম পড়িস্ নে কো
তলা বিছিয়ে পড়্।
খুকু খাবে পেট ভরে
নিয়ে যাবে ঘর॥

৩৭৯

ঝাড় লণ্ঠন হাতি
থাকলে রাজার নাতি।
ধামা কুলো নাড়ে
ঝক্কি বইতে পারে।
যার চ্যাটাং চ্যাটাং বাত
চাটুক এঁটো পাত॥

৩৮০

ঝুনু যাবে শ্বশুরবাড়ি
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে কেলে কুকুর
সেই তো সেজেছে॥

৩৮১

টিয়ে টিয়ে টিয়ে
লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছা লবো না
আর কাপড় লবো।
তসর করে খসর মসর ধোপাবাড়ি যাব।
ধোপাদের তেল আমলা
মালীদের ফুল।
এমন ঝোটন বেঁধে দিব
হাজার টাকা মূল॥

৩৮২

টিপির টিপির জল পড়ে ফুলবাগানে কে?
আমি বটি ভাসুরঝি খুড়িকে ডেকে দে।
খুড়ি খেলেন পান খিলিটি আমি মলাম লাজে
উথালি পাতালি খুড়ি দরিয়ার মাঝে॥

৩৮৩

টুক্‌নি লো সই
পিঁড়ি দে লো বই,
ছোটোবেলা মা মরেছে
দুঃখের কথা কই।

মা মরল দুধের বাচ্চা থুইয়া
এমন পোড়ানি পুড়ে গো
তুষের আগুন দিয়া॥

৩৮৪

টুম্-টমা-টুম্ বাদ্দি বাজে
লোকে বলে কী।
খোকামণি বিয়ে করে
বড়ো মান্ষের ঝি॥

৩৮৫

টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে
লোকে বলে কী?
শামুক রাজা বিয়ে করে
ঝিনুক রাজার ঝি॥

৩৮৬

ট্যান্ ট্যানা ট্যান্ ট্যান্
কেলে ভুতোর ঠ্যাং।
ঠ্যাং-এ দিলাম কোপ
বেরোল দুই পোক।
পোকে দিলাম আগুন
বেরোল দুই বেগুন।
বেগুন দিল রাঁধতে
খোকার বউ বসল কাঁদতে॥

৩৮৭

ট্যাঁপ্ ট্যাপ্ ট্যাঁপ্ ট্যাঁপের ভিতর ঝিঙে।
বৃষ্টি বাদল হলে ট্যাঁপ্ বসে বাজায় শিঙে

৩৮৮

ঠক্ ঠক্ ঠকিলা
মোকে বেশি বকিলা।
ধান ভাঙিল সীতারাম
চড়ক চড়ক সূর্য বাণ
পঞ্চবাণ পঞ্চ আঁটি
বাহির হয় নাটি খুঁটি॥

৩৮৯

ঠাকুর জামাই চাকরি কামাই
মাসে দু-বার আসে।
না জানি সে ঠাকুরঝি-কে
কত ভালোবাসে॥

৩৯০

ঠিক দুক্কুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি।
ভূত আমার পুত
শাকচুন্নি আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টা আমার কি?

৩৯১

ডগা রে ডগা	কী রে ডগা?
গাছে কেন?	বাঘের ডরে।
বাঘ কই?	মাটির তলে।
মাটি কই?	অই ত অই।
তোরা ক'ভাই?	সাত ভাই।
আমাকে একটা দিবি?	ছুঁইতে পারলে নিবি॥

৩৯২

ডান ডাইনি বেলের আঁশ
সরষে পোড়ায় করলাম নাশ।
সরষের ধকে মাথা চৌচির
লহু ধিকি ধিকি ফুঁড়ে তার শির।
ঘরে আছে রাম সীতা
ডাইনি বেটি জানিস্ কি তা॥

৩৯৩

ডালিম গাছে পরভু নাচে
তাক্ ধুমাধুম্ বাদ্যি বাজে।
আই গো চিনতে পার
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নব্যঞ্জন দুধের সর
কাল যাব গো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি
থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ি।
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল্ শ্বশুর বাড়ি॥

৩৯৪

ড্যাং ড্যাং শালুক ডাঁটা
মামাকে আনতে পাঠা।
মামাদের কচুবনে
কচুশাক খায় না কেনে।
বেলাঙ্গিতে বাদ্য মরেছে
তোমাকে যেতে বলেছে।
তুমি নাও ঘি কলসি
আমি যাই বাউটি হাতে
চল যাই রাজপথে।
মণ্ডি মনোহরা।
জিলিপি রসকরা॥

পাঠান্তর ঃ

বোম্ বোম্ শালুক ডাঁটা
এতদিন ছিলে কোথা?
মামাদের কচু বাড়িতে।
কচুশাক খাও না কেনে?
মামারা দিবেক কিনে।
মামাদের পাখি ম'ল
আমাকে যেতে হল
চিঁড়ে দই খেতে হল।
তুমি নাও ঘি কলসি
আমি নিই ঝাঁঝরি হাতে
চল ভাই রাজপথে।
রাজার এক কন্যা আছে
বিয়ে হবে তার সাথে॥

৩৯৫

ডিম্ ডিমা ডিম্ ডিম্ ডিমা ডিম্
কিসের বাদ্যি বাজে
চাঁদের বেটা লখিন্দর
বিয়ে করতে সাজে।
আগে যায় গাড়ি ঘোড়া
পিছে যায় হাতি,
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ্
কাঁধে ধরে ছাতি॥

৩৯৬

ডুমুর গাছে কুমুড় নাচে
তাক্ ধুমাধুম্ বাদ্যি বাজে।
মামু তোর পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি।
বউর কপালে সোনার টিকে
বউ দেখতে চৌদ্দ সিকে॥

৩৯৭

ঢাকা দিয়ে শেয়াল খায়
পেঁড়োয় কুকুর ডাকে।
শান্তিপুরের বুড়ি বলে
কামড়ালে মোর নাকে॥

৩৯৮

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে
সুন্দরীর বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।

ডাকাত আলো মা
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে দিলে
দেখতে দিলে না।
আগে যদি জানতাম
ডুলি ধরে কান্‌তাম॥

৩৯৯

ঢোল বাজে গামুর গুমুর
সানাই বাজে রইয়া।
পরের পুতে নিতে আইছে
ঢোলে বাড়ি দিয়া।
আও লো খেলার সই
খেলার সাজ লইয়া
আর তো খেলবাম্‌ না
পরের ঘরে গিয়া॥

৪০০

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছা
খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল
আঁকড়া বাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলাব্যাঙ বড়ই সেয়ানা
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ চোদ্দ হাজার ঢালি।
হুগলির শহরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই
সেখান থেকে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মনির হাটে
একটা ছিল সোনা ব্যাঙ আগলিল পথে।

সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি উঠল গিয়ে ডালে
একটা ছিল কোলাব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি নামল গিয়ে ভুঁয়ে
একটা ছিল কট্‌কটে ব্যাঙ মারল লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি
চৌদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁই-ফাঁই
না মার না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই॥

৪০১

তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি ভারি মজা কিল চড় নাই॥

৪০২

তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই।
মামা দিল দই সন্দেশ
গৈলে বসে খাই।
মামি এল ঠেঙা নিযে
প্রাণ নিয়ে পালাই॥

৪০৩

তাইরে নাইরে বন্ধু রে
কলা খাইল ইন্দুরে।
কলার ভিতর আলি নাই
পয়সা দিতে মানা নাই॥

৪০৪

তাক্ থুড়া-থুড়্-থুড়া
ভাঙল খাটের খুরা।
ঘরে নাচে শ্যামসুন্দর
বাইরে নাচে বুড়া।
তাক্ থুড়া-থুড়্-থুড়া॥

৪০৫

তাক্ থুড়া-থুড়্-থুড়া
ভাঙল গাছের গোড়া
নামল হাতের থোপ।
খোকার নাচন দেখতে এল
সওদাবাদের লোক।
সওদাবাদের ময়দা রে ভাই
বহরমপুরের ঘি
খাসা করে লুচি ভেজে
খোকার মুখে দি॥

৪০৬

তারা করেন ঝিকিমিকি
চাঁদ করেন আলো।
যে ঘরেতে পুত্র নাই
তার ঘর কালো॥

৪০৭

তালগাছ কাটুম বোসের বাটুম গৌরী লো ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী।
আন্‌কা ভেঙে সান্‌কা দিলুম কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখে এলুম বুড়োর চাপদাড়ি।

চোখ খাক্ তোর মা বাপ চোখ খাক্ তোর খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছে তামাকখেকো বুড়ো।
বুড়োর নল গেল ভেসে বুড়ো তামাক খাবে কিসে
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

৪০৮

তালগাছেতে হুতুম থুমো কান আছে পাঁদারু
মেঘ ডাকছে বলে বুক করছে গুরুগুরু।
তোমাদের কিসের আনাগোনা
উড়ে মেড়ার বাপ আসছে তাক্ ধিনা ধিন্ ধিনা॥

৪০৯

তালগাছেতে হুসুর মুসুর
বাঁশগাছেতে থানা।
কাল কাসুন্দার বনে আছে
বাদশাহী বিছানা—
নদের ফটিকচাঁদ এসেছে॥

৪১০

তালগাছে সুপারি সুপারি গাছে তাল
খঞ্জন পাখির নাচ দেখিয়া বেঙে লইছে ফাল॥

৪১১

তুলসী তুলসী রামতুলসী পাতা
দেখে যাও গো খোকার মা
খোকার ধুলো মাখবার ঘটা॥

৪১২

তেলি—হাত পিছলে গেলি।
নুন—খানায় পুড়ে খুন॥

৪১৩

তোদের হলুদ মাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব
আমরা উল্‌টো রথে যাব॥

৪১৪

তোর সঙ্গে আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর।
কি করবি কর্‌
মাথা খুঁড়ে মর্‌॥

৪১৫

তোল্‌ তোল্‌ পাল্‌কি তোল্‌।
খোকনমণির বউটি ভালো।
সব ভালো তার রংটি কালো

৪১৬

থুম্‌ থুমানি সই
গাছ কুমারি কই?
গাছ নিল কুমারে
ধরে আনি তোমারে॥

৪১৭

থেনা নাচেন থেনা
বট পাকুড়ের ফেনা
বলদে খালো চিনা
ছাগলে খালো ধান
সোনার জাদুর জন্যে যা রে
নাচন কিনে আন্॥

৪১৮

থেইয়ে নাচন মধুর বচন
তোমরা বল কী—
মনের আনন্দে আমরা
গোপাল নাচিয়েছি॥

৪১৯

থৌ থৌ থৌ
থৌয়ে দিলাম মৌ
আমি যেন হই রাজার বৌ।
থৌ থৌ থৌ
থৌয়ে দিলাম ঘি
আমি যেন হই রাজার ঝি॥

৪২০

দশ কুড়ি নাড়ি ভুঁড়ি
চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি
আমতলায় ঝাপুর ঝুপুর
কলাতলায় বিয়ে।
ওই আসছে খেঁদির বর
গামছা মাথায় দিয়ে।

ওই গামছা নেব না
খেঁদির বিয়ে দেব না
খেঁদিকে দেব সাজিয়ে
টাকা নেব বাজিয়ে॥

৪২১

দাদা গো দাদা শহরে যাও
তিন টাকা করে মাইনে পাও।
দাদার গলায় তুলসী মালা
বউ বরণে চন্দ্রকলা।
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি
বউটা দে না খেলা করি॥

৪২২

দাদাভাই চালভাজা খাই
        নয়না মাছের মুড়ো
হাজার টাকার বউ এনেছি
        খ্যাদা নাকের চুড়ো।
খ্যাঁদা হোক্ বোঁচা হোক্
        সব সইতে পারি
ঝাম্‌টা কাটা মুখনাড়াটা
        ওই জ্বালাতেই মরি॥

৪২৩

'দাদা' 'দাদা' হাঁক পড়েছে দাদা নাই ঘরে।
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে
দাদাকে নিয়ে যাব দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মাঠে রে ভাই হাতি নেবেছে
হাতির গলায় গজঘণ্টা বেজে উঠেছে
নেড়ে চেড়ে দেখ্ না বুড়ো মালা পেতেছে॥

৪২৪

দামুস্ দামুস্ করে পা
মল গড়িয়ে দে না মা।
আসুক তাঁতি বিকুক সুত
মল গড়িয়ে দেব রে পুত॥

৪২৫

দিদিমণির কোলে
খুকুমণি দোলে।
খুকু দোলে নড়ে চুল
খুকুর মাথায় চাঁপাফুল।
খুকুর গালভরা হাসি
মানিক ঝরে রাশি রাশি॥
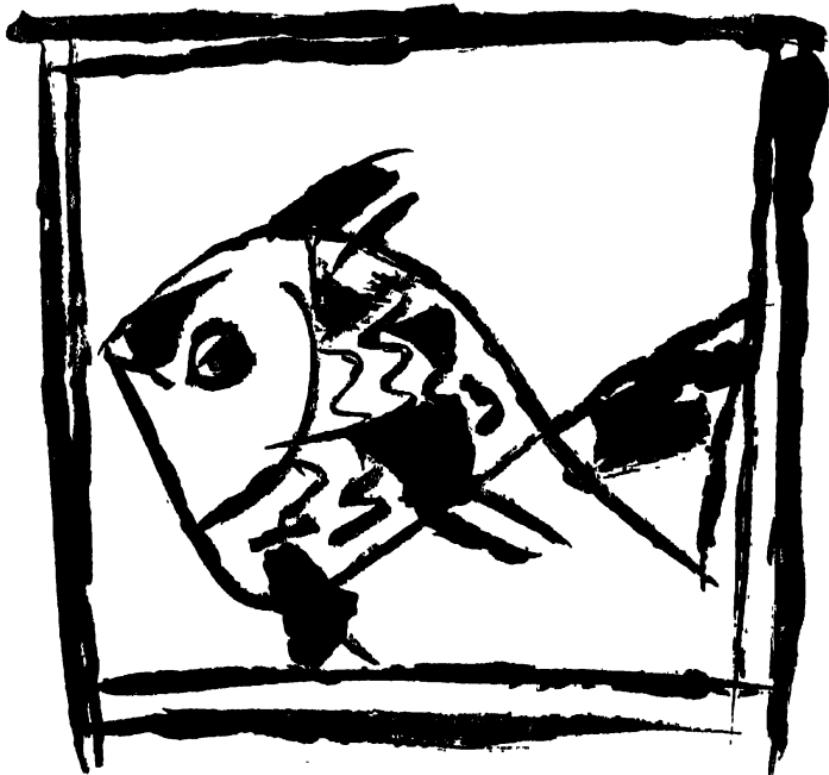
৪২৬

দিদি লো দিদি　　শোন্ সে কথা।
কী কথা সই?　　ব্যাঙের মাথা।
কী ব্যাঙ?　　সোনা ব্যাঙ্।
কী সোনা?　　কেষ্ট সোনা।
কী কেষ্ট?　　ধিনি কেষ্ট।
কী ধিনি?　　তাক ধিনি।
কী তাক?　　চুপ করে থাক্।

পাঠান্তর ঃ

দিদি লো দিদি　　একটা কথা।
কী কথা?　　ব্যাঙের মাথা।
কী ব্যাঙ্?　　সরু ব্যাঙ্।
কী সরু?　　বামুন গোরু।
কী বামন?　　ভাট বামন।
কী ভাট?　　গুয়া কাট।
কী গুয়া?　　চিকি গুয়া।
কী চিকি?　　সোনা চিকি।
কী সোনা?　　ছাই খা না।
তার অর্ধেক ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে করব কী?
তোর ভাগ তোরে দি॥

৪২৭

দিদি লো দিদি, নাইতে যাবি?
কোন্ পুকুর? তালপুকুরে।
তালের জটা, বাধলো ল্যাঠা।
বড় বউয়ের কি ছেলে? বেটা ছেলে।

নাম কি? দুর্গাচরণ।
খায় কী? দুধিভাতি।
কোমরে কোমরপাটা
খোকন আমার সোনার ভাঁটা॥

৪২৮

দুখ-পাসরা নয়নতারা খোকা আমার কই?
খোকামণিরে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে রই॥

৪২৯

দুলতে দুলতে এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ।
এই চাঁদটি কাদের
কপাল ভালো যাদের॥

৪৩০

দে টপাটপ্ নে টপাটপ্—
ভাবনা কিছুই নাই।
দে দই—দে দই পাতে
ওরে বেটা হাঁড়ি-হাতে।
হাপুস হুপুস খায়
আরো দাও—তবু চায়।
হাতে দই পাতে দই
তবু বলে—কই কই।
আরো কী চাই?
দে টপাটপ্ নে টপাটপ্
ভাবনা কিছুই নাই॥

৪৩১

দেবতার মা বুড়ি কাট নাই পেলি
ছ-খানা কাপড় পেলি ছ-বউকে দিলি।
আপনি মরে জাড়ে
কলার গাছের আড়ে।
কলা পড়ে ধুপ্‌ধাপ্‌
বুড়ি খায় গুপ্‌গাপ্‌
এক সের আটা
দু সের পাটা॥

৪৩২

দোল দুলতে এল বান
হেজে গেল জলার ধান।
যাক্‌ ধান থাকুক নাড়া
কেটে দিব রাঙ্গা ধাড়া।
রাঙ্গা ধাড়া পাটের থোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥

৪৩৩

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মর?
আপনি বুঝিয়ে দেখ
কার ঘর কর॥

৪৩৪

দোল্ দোল্ খাঁদা দোলে,
তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলে।
ধিন্ ধিন্ ধিন্ খাঁদা নাচে,
না তিন্ তিন্ নূপুর বাজে।
নাচে খাঁদা তুড়্ তুড়্ তুড়্
দামা বাজে গুড়্ গুড়্ গুড়্॥

৪৩৫

দো্ল দোল্ দোল্ দোল্
কীসের এত গোল?
খোকা আসছে বিয়ে করে
সঙ্গে ছ'শো ঢোল।
থামল ঢোলের রব
খোকামণি ঘুমিয়ে প'ল
শান্ত হল সব॥

৪৩৬

দোল্ দোল্ দোলানি
কানে দেব চৌদানি।
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।
মেয়ে নয়কো সাত বেটা
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা।
দেখ্ শত্তুর চেয়ে
আমার কত সাধের মেয়ে॥

৪৩৭

দোল্ দোল্ যাদু দোলে
দোল্ দোল্ খোকা দোলে
দোল্ দোল্ ধন দোলে
মা মণি এস কোলে॥

৪৩৮

দোলে রে মাল
চন্দনী গোপাল।
দুধি ভাতি খেয়ে খুকুর
ভুতি ভুতি গাল॥

৪৩৯

ধন আমার কোন্‌খানে
চন্দন বন যেখানে।
সেখানে ধন কী করে
ডাল ভাঙে আর ফুল পাড়ে॥

৪৪০

ধনকে কিসে গড়েছে
কাঁচা সোনা কুঁদে কেটে
ছাঁচে ফেলেছে।
ধন ধন ধন গগনশশী
টুক্‌টুকে মুখ দেখন-হাসি॥

৪৪১

ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে দুধের গতরে
দুধ লাড্ডু পাকা গলা গালের ভিতরে।
ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
আমার গগনচাঁদের বালাই নিয়ে মরে যাবে সে কাল॥

৪৪২

ধন কেন গো ধুলায় পড়ে
ধুলোমাখা সাজ?
কিসের তরে এমন করে
মুখটি ভারি আজ?
কে মেরেছে কে ধরেছে
কে দিয়েছে গাল?
তার সঙ্গে ঝগড়া করে
আসব আমি কাল॥

৪৪৩

ধনকে নিয়ে বনকে যাব
থাকব বনের মাঝে।
আয় দেখিনি নীলমণি তোর
কেমন ঘুঙুর বাজে।
তোরে নাচলে কেমন সাজে
ঝুনুক ঝুনুক বাজে॥

পাঠান্তর ঃ

ধনকে নিয়ে বনকে যাব
থাকব বনের মাঝে।
আয় দেখি লালমণি তোর
কেমন নূপুর বাজে।
সোনার পায়ে সোনার নূপুর
কেমন ধারা বাজে।
তাই তাই তাই নাচলে পরে
ঝুনুক ঝুনুক বাজে॥

৪৪৪

ধনকে নিয়ে বনকে যাব
    রইব গাছের তলে।
কোলে বসে সোনার যাদু
    ডাকবে মা মা বলে।
এখন একবার ডাকো দেখি
    আমার নয়নমণি।
মা-বোল্ কেমন ধারা
    বলো দেখি শুনি॥

৪৪৫

ধনকে নিয়ে বনকে যাব
    সেখানে খাব কী?
নিরলে বসিয়ে ধনের মুখ নিরখি

৪৪৬

ধন গেছে গো বেড়াতে
পায়ের নূপুর হারাতে।
যাক্‌গে নূপুর হারিয়ে
আবার দেব গড়িয়ে।
আয়রে গোপাল ঘরে আয়
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায়॥

৪৪৭

ধন ধন ধন ছেলে
পথে বসে কি কাঁদছিলে?
মা বলে কি ডাকছিলে?
ধুলো কাদা কত মাখ্‌ছিলে?
সে যদি তোমার মা হ্‌ত
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত॥

৪৪৮

ধন ধন ধন
বাড়িতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার কীসের জীবন।
সে কীসের গরব করে
যাদুর গুণের বালাই নিয়ে
কাল যেন সে মরে॥
পাঠান্তর ঃ
সে যেন আগুনে পুড়ে মরে
সে যেন মাথা খুঁড়ে মরে॥

৪৪৯

ধন ধন ধন
দর্পনারায়ণ।
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে॥
পাঠান্তর ঃ
ধন ধন ধন
বাড়িতে নটের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।
তারা কিসের গরব করে
উনুনে পুড়ে কেননা মরে॥

৪৫০

ধন ধন ধন ধন।
ই ধনকে দেখতে লারে, পুড়ুক তার মন।
ধন ধকড়া টাকার তোড়া ধনের মুরালি
ই ধনকে দেখতে লারে কোন্ বিরালি॥

৪৫১

ধন ধন ধনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হিরের টোপ
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥

৪৫২

ধন ধন ধন পায়রা
এ ধন পায় কারা?
সাত সাগর মথন করে
ধন পেয়েছি আমরা।
সাগরে ঢালিয়া গা
হয়েছি নীলমণির মা॥

পাঠান্তর ঃ
ধন ধন ধন পায়রা
এমন ধন পায় কারা?
ঘোষ পাড়ায় কামনা করে
ধন পেয়েছি আমরা।
এ ধন যাদের নেই ঘরে
তারা কি নিয়ে ঘর করে॥

৪৫৩

ধন ধন ধন
লক্ষ্মীনারায়ণ।
এ ধন যে দেখতে নারে—
পুড়ুক তার মন,
ছিঁড়ুক তার কাঁথা,
এমন ধন দেখেছ কোথা?

ধন ধোক্‌ড়া টাকার তোড়া
ধনের মুরলী—
সাত রাজার ধন মানিক আমার
যেন পদ্মকলি॥

৪৫৪

ধন ধোনা ধন ধোনা
চোত বোশেখের বেনা
ধন বর্ষাকালের ছাতা
জাড়কালের কাঁথা
ধন চুল বাঁধবার দড়ি
হুড়কো দেবার নড়ি
পেতে শুতে বিছানা নেই
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি।
ধন পরানের পেটে
কোন্ পরানে বলব রে ধন
যাও কাদাতে হেঁটে।
ধন ধোনা ধন ধন
এমন ধন ঘরে নেই তার
বৃথায় জীবন॥

৪৫৫

ধনমণি রে হারা
তুমি যেয়ো না গোয়াল পাড়া।
তোমার চুড়ো বাঁশি কেড়ে নিয়ে
বলবে মাখন চোরা॥

৪৫৬

ধান খাইল ধানুয়া পোকে
গরু খাইল জোঁকে।
আর বছরের খাজনা দিলম
চড়াইর বউকে॥

৪৫৭

ধান ভানি ধান ভানি
মচ্ছির গুঁড়ো দিয়ে
ওই আসছে খোকার শ্বশুর
দু-খান কুলো নিয়ে।
একখান কুলো মাঠে
একখান কুলো ঘাটে
বাঁশ মড়মড় করে।
সোনার টোপর ভেঙে গেল
কে গড়িতে পারে?
খোকার ভাই বলরাম
সে গড়িতে পারে॥

৪৫৮

ধা রে মশা ধা।
আমাদের বাড়ির যত মশা
পাশের বাড়ি যা॥

৪৫৯

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা
ডাল-ভাতে চড়িয়ে দে না।
বাবুর বাড়ির কাগজি লেবু
খেতে চেয়েছেন রামজি বাবু।

রামজি বাবুর পরনে ট্যানা
বে করেছে বিড়াল ছানা।
একটি ধানে দুইটি তুষ
আয়রে মণি পুষ্‌পুষ্‌॥

৪৬০

ধিন্‌তা নাচন মধুর বচন তোমরা বল কী
মনের আনন্দে আমি খোকন নাচাচ্ছি।
নাচিতে নাচিতে খোকার গা হল আগুন
খোকার শাশুড়ি তত্ত্ব দিল গোটা দুই বেগুন।
আর নেচো না যাদুমণি, চরণ হল ভারি
ঘাম দিল চাঁদমুখে খোকার কাছে হারি॥

৪৬১

ধিন ধিন ধিনা
ছাগলে খায় চিনা
মেড়ায় খায় ধান।
খোকার বৌ-র চুল ধরে টান॥

৪৬২

ধুস্‌কুমড়ো নেবে গো
ছ-পণ কড়ি দেবে গো॥

৪৬৩

ধুলায় ধূসর নন্দকিশোর
ধুলা মেখেছে গায়।
ধুলা ঝেড়ে কোলে কর
সোনার যাদু রায়॥

পাঠান্তরঃ
ধুলোর দোসর নন্দকিশোর
ধুলো মাখা গায়।
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে
আয় নন্দরায়॥
ধুলোর দোসর নন্দকিশোর
ধুলো লেগেছে গায়।
ধুলো ঝেড়ে নাও রে কোলে
প্রাণ জুড়োবে তায়।
ধুলোর দোসর নন্দকিশোর
গা করেছ খড়ি।
কলুবাড়ি যাও তেল আনগে
আমি দিব তার কড়ি॥

৪৬৪
ধেই ধেই খোকন নাচে।
কচি কচি হাত দু-খানি
    তুলে আমার খোকন নাচে।
নাচ দেখে তোর নাচে পুষি
    বানর নাচে গাছে।
ময়ূর নাচে কুকুর নাচে
    বনে শেয়াল নাচে।
দাঁড়ে নাচে কাকাতুয়া
    আর নাচে টিয়া
পুকুরপাড়ে নাচে ব্যাঙ
    মাথায় হাত দিয়া।
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে।
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে॥

৪৬৫

ধেই ধেই চাঁদের নাচন
বেলা গেল চাঁদ নাচবে কখন।
নেচে নেচে কোলে আয়
সোনার নূপুর দেব পায়।
নেচে আয়রে নীলমণি
তোর নাচন দেখব আমি॥

৪৬৬

ধেই ধেই ধেই ধেই
আমার খোকা নাচে ধেই।
ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা
তিন্‌তা তিন্‌তা তিন্‌তা
আয়রে ভোলা আয়।
নেচে নেচে খোকনমণি
গড়াগড়ি যায়॥

পাঠান্তর ঃ
ধেই ধেই ধেই ধেই
খোকা নাচে ধেই।
ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা
খোকা নাচে তিন্‌তা।
আয়রে চাঁদা দেখ্‌সে আয়
খোকা আমার নেচে যায়॥

৪৬৭

ননি আমার কে গো।
জল গড়িয়ে দে গো।

জলের ভিতর লাল মাটি
ননি আমার সোনার কাঠি॥

৪৬৮

ননির গোপাল ননির শরীর
নধর নধর গা।
পাড়া পড়শি ডাকলে কারো
ঘরকে যেয়ো না।
তুমি আমার বুকভরা ধন
পরান পুতলি।
ঘরে থাকো বাছা আমার
উঠান আলো করি॥

৪৬৯

নাই ঘরের তাই খোকা অন্ধের নড়ি
তিলমাত্র না দেখিলে বুক ফেটে মরি।
খোকন যখন হাসে
মুক্তা যেন ভাসে।
যখন খোকন হাঁটে
রক্তে চরণ ফাটে॥

৪৭০

নাক ওঠে নাক ওঠে—ধানের শিষ
নাক ওঠে নাক ওঠে—প্রদীপের শিষ
নাক ওঠে নাক ওঠে—পানের বোঁট
জাদুর নাকটা—শিগগির ওঠ্॥

৪৭১

নাকছাবি গয়না
কবে দিবে বল না।
যদি বল কাল দিব
ভোরে উঠে চলে যাব
বলে যাব না॥

৪৭২

নাকের বদলে নরুন পেলুম
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।

হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।
বউর বদলে ঢোলক পেলুম
টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্॥

৪৭৩

নাচতে জানি নাচি না
কোমর ব্যথায় বাঁচি না।
ভাই এসেছে তাই
কোমর ব্যথা নাই॥

৪৭৪

নাচ্‌নি গেছে কাচনিপাড়া
দেয়া নামছে জল।
সোনার নাচ্‌নি ভিজে যায় রে
লাল ছাতিটা ধর্॥

৪৭৫

নাচে বুড়ো নাচে ধাড়ি
নাচে খোকার মা।
কেঁচো মশায় বলে ওঠে
নাচব আমি তা॥

৪৭৬

নাদুসনুদুস নন্দগোপাল
কাঙালিনির ধন
আমার দুখ-পাসরা দুঃখহরা
অশ্রু নিবারণ।

কেমন গড়ন কেমন পেটন
কেমন ছিরি ছাঁদ
বলতে গেলে বাছা আমার
নীল গগনের চাঁদ॥

৪৭৭

নাম করলুম, পচে গেলুম
গঙ্গাজলে শুদ্ধ হলুম।
কলাপাত রে কলাপাত
সূয্যিকে দণ্ডবৎ॥

৪৭৮

নিমপাতা কাসুন্দির ঝোল
তেলের উপর দিয়ে তোল
পলতা শাক রুই মাছ
বলে ডাক বেগুন গাছ॥

৪৭৯

নুনু গেইছে খেলা করতে খেল্‌কদমের তলা।
ডাকলে নুনু রা দেয় না ভাত খাবার বেলা।

৪৮০

নেচে আয়রে নেচে আয়রে
আয়রে চাঁদের কণা।
মুরলী গড়ায়ে দেব যত লাগে সোনা॥

৪৮১

নেড়া তেলকাম্‌ড়া তেলে ভাজা বড়া
সকল বড়া খেয়ে গেল, নেড়ার গলায় দড়া

৪৮২

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু-পারে দুই রুই কাত্‌লা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে।
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্‌খানে দে', বকুলতলা দে'।
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ঝরে পড়ে॥

পাঠান্তর ঃ

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
সরু সরু চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে বাজুবন্ধ ছুঁড়ে মেরেছে।
উহু-হু বড্ড লেগেছে॥

৪৮৩

নোলা করে সর সর
ও নোলা তুই সামাল কর।
আগে যাবি নোলা বাপের ঘর
তবে খাবি নোলা দুধের সর॥

৪৮৪

পটল আমাদের কই্ রে
জলে ভাসে খই্ রে।
জলটা হ্ল গোবর-মাটি
পটল আমাদের গলার কাঁটি॥

৪৮৫

পটল আমার ধন।
যেয়ো না রে বন।
তোমার নেগে গড়িয়ে দেব
রত্ন সিংহাসন॥

৪৮৬

পটলচেরা চক্ষু টুনুর, বাঁশির মত নাক।
টুনুর শ্বশুর হবে বুড়ো ফোক্লা মাথায় টাক।

৪৮৭

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় ছন্দ
ছেলেতে ছেলেতে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব।
বুড়ায় বুড়ায় কথা সকল কথায় কাসি
যুবায় যুবায় কথা সকল কথায় হাসি॥

৪৮৮

পথের মাঝে বেঙি বসে, বেঙ ছিলেন ঘুমিয়ে।
সেই পথে এক হাতি গেল বেঙেরে ডিঙিয়ে।
দেখে বেঙি রেগে বলে, আরে বেটা গোদা-পাও,
এত বড় সাধ্যি তোমার মোর প্রভুকে ডিঙিয়ে যাও!
যদি প্রভু জাগত,
তবেই তো খুনোখুনি লাগত।
শুনে হাতি হেসে বলে, ওগো ভেচ্‌কিমুখি,
তোর প্রভু কি করতে পারে, তুই বা পারিস্‌ কী?
যদি আমি মনে করি,
তোর প্রভুকে চট্‌কে মারি।
রেগে বেঙি বলে যেয়ে ছুঁচোর মেয়ের কাছে—
ওলো গন্ধবেনের ঝি,
কথা শুনে গা জ্বালা করে, আমি নাকি ভেচ্‌কিমুখি?
ছুঁচোর মেয়ে মুচ্‌কি হেসে বলে কদর করে,
রূপের ডালি বিদ্যাধরী তুমি যাও ঘরে।
ছোটো লোকের সঙ্গে কি কেউ বাক্যি আলাপ করে॥

৪৮৯

পরের ছেলে—ছেলেটা
খায় যেন এতটা
নাচে যেন বাঁদরটা।
আমার ছেলে—ছেলেটি
খায় যেন এতটি
নাচে যেন ঠাকুরটি॥

৪৯০

পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু
মেয়েটি যেন কল্পতরু।
মেয়ে হব ঘর নিকুব, পরব পাটের শাড়ি
খড়খড়েতে চড়ে যাব জমিদারের বাড়ি॥

৪৯১

পাগল হাতি মাথা নাড়ে
ঝপ্ ঝপাঝপ্ তেঁতুল পড়ে।

৪৯২

পাগ্‌লি সরায় বসে
সরা গেল ভেসে
পাগ্‌লি মরে হেসে॥

৪৯৩

পানকৌটি পানকৌটি ডাঙায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোট্ সে।
ও বেগুনটি কুটো না বীচ রেখেছে
ও দুয়ারে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥

পাঠান্তর ঃ ১

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ি বলে গেছেন আলু কোট্'সে।
কী করে কুটব—চাকা চাকা করে।

ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে
বঁধুর পান খেয়ো না ঝগড়া করেছে
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে॥

পাঠান্তর ঃ ২
পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় উঠ'সে
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোট'সে।
বেগুন হল ফালা ফালা
বউ পালাল দুপুরবেলা
ওমা এ বউ তো ভালো নয়॥

৪৯৪
পানকৌড়ি উঠ উঠ
জামাই এল পিঠা কুট।
আসুক জামাই বসুক মাটি
তবে দিব পরের বেটি।
পরের বেটি নড়ে চড়ে
সাত সতিনে ডুবে মরে॥

৪৯৫
পাহাড় মাটি কাঁটা খাই
ব্যায়রাম ঝেড়ে বাড়ি যাই
খোল ঝাড়ি নল্‌চে ঝাড়ি
সাত ছিনালের নাক।
সবাই-এর মা চণ্ডীর বরে
ব্যায়রাম ট্যায়রাম যাক্‌॥

৪৯৬

পুঁটু আমার কেঁদেছে
কত মুক্তো পড়েছে।
যখন পুঁটু আমার হয় নাই
ভিখারিতে ভিখ্ নেয় নাই।
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে
ভিখারিতে ভিখ নিয়েছে।

৪৯৭

পুঁটু আমার মেঘের বরণ
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ।
চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী।
পুঁটুর রূপ কে দেখবি দেখ্‌সে আয়
নব ঘন মিশেছে তায়॥

৪৯৮

পুঁটু আমার লক্ষ্মী সোনা।
আদা দিয়ে চাল ভিজাল
গেরদা গুড়ের পানা।
কেমন নাচে কেমন হাসে
কেমন গায় গান।
শুনলে পরে জগৎজনার
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ॥

৪৯৯

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে
শতদলের মাঝখানে।

সেখানে পুঁটু কি করে?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে॥

৫০০

পুঁটু পুঁটু ডাক ছাড়ি
পুঁটু গেছে কার বাড়ি
নিয়ে আয় গো ফুলের ছড়ি।
পুঁটু কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
কাল যাব মা গঞ্জের হাট
কিনে আনব শুকনো কাঠ
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত॥

৫০১

পুঁটুমনি গো মেয়ে
বর দেব চেয়ে।
কোন্ গাঁয়ের বর
নিমাই সরকারের ব্যাটা
পালকি বের কর্।
বের করেছি বের করেছি
ফুলের ঝারা দিয়ে।
পুঁটুমনিকে নিয়ে যাব
বকুলতলা দিয়ে॥

৫০২

পুঁটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁধে।

পুঁটু যদি রে হাসে
আমি উঠব হেসে হেসে।
পুঁটু নাকি রে কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
কাল যাব মা গঞ্জের হাট
কিনে আনব শুকনো কাঠ।
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত
আমি কাটব আঙট্ পাত॥

৫০৩

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী গুণবতী
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী।
হবে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে,
মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।
গঙ্গাজলে শঙ্খের ধ্বনি
মরে যেন হই রাজরানি।
এবার মরে মনুষ্য হব
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম পাব
দশরথের মতো শ্বশুর পাব
কৌশল্যার মতো শাশুড়ি পাব
গিরিরাজের মতো বাপ পাব
মেনকার মতো মা পাব
দুর্গার মত সোহাগি হব
কার্তিক গণেশ ভাই পাব
কুবেরের ধন পাব
আবিরের বর পাব॥

৫০৪

পুষ্ পুষ্ ময়না
ভাত খাবি তো আয় না।
কাল দিইছি গয়না
আজো বিয়ে হয় না
পুষ্ পুষ্ ময়না॥

৫০৫

পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেয়ো না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেয়ো না
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেয়ো না
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেয়ো না
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেয়ো না।

পাঠান্তর ঃ

এসো পৌষ যেয়ো না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না
পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি, হাতে নড়ি, কাঁকে ঝুড়ি
পৌষ আসছে গুড়ি গুড়ি
আনব গাঙের জল, ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো
বাহান্ন পৌটি হয়ো,
ঘরে বসে পিঠে খেও
এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো॥

৫০৬

ফিঙ্‌ফিঙেটি বাবুই হাটি
কোন্‌খানে তোর বাসা?
আমার যাদুর বিয়ে হবে
বউটি হবে খাসা॥

৫০৭

ফুল ফুল ফুলুনি
        ফুলুরে পাতা।
তার মাঝে নেকা জোকা
        ভাবের কথা।

৫০৮

ফুলমালা আর রঙ্‌মালা
ভাত রান্ধিবেন কোন্ বেলা?
বেলা হইল দুই পহরে
খাবার আসিবে কর্পূর।
কর্পূরের আগ ভারি
চলি যাইবে ভাত ছাড়ি,
ভাত থাকিবে হাঁড়িতে
চলি যাইবে গাড়িতে॥

৫০৯

বউ কাঁদো না কাঁদো না শ্বশুরবাড়ি যেতে
হাত গামছা পাও গামছা দাসী দেব সাথে।
বড়ো বড়ো কড়ি দেব খেয়া পার হতে
ছোটো ছোটো কড়ি দেব মণ্ডা কিনে খেতে।
আম কাঁঠালের বাগিচা দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে
দুধের পুষ্করণী দেব ঝাঁপুর খেলাতে॥

৫১০

বউ লো বউ, দা খানা কই?
দা দিয়ে কী করবি? পাত কাটব।
পাত দিয়ে কী করবি? ভাত বাড়ব।

ভাত দিয়ে কী করবি? খাব।
খেয়ে কী করবি? কামারবাড়ি যাব।
কামার বাড়ি গিয়ে কি করবি? ছুঁচ গড়াব।
ছুঁচ গড়িয়ে কি করবি? থলি সেলাইব।
থলি দিয়ে কি করবি? টাকা কড়ি রাখব।
টাকা কড়ি দিয়ে কি করবি? দাসী কিনব।
দাসী দিয়ে কি করবি?
খোকনকে খাওয়াবে দাওয়াবে কোলে তুলে নাচাবে।

৫১১

বকমামা বকমামা
ফুল দিয়ে যাও।
নারকেল গাছে কড়ি আছে
গুনে নিয়ে যাও॥

৫১২

বকের সাদা শাকের ছাঁ
রাঙাদিদি খোকার মা
আমি না এলে যেও না॥

৫১৩

বগা রে বগি রে এবার বড়ো বান
ডাঙা দেখে ঘর বাঁধব খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগড়ি, বগির মাথায় চুল
সত্যি করে বল রে বগা যাবি কত দূর।
আমি যাব বিলে বিলে
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে
দাদার হাতের লকড়িখান ফেলে মেরেছে॥

৫১৪

বড়ো দিদি গো ছোটো দিদি গো
বেগুন ভাজা খাবি?
অদল বদল বংশী বদল
শ্বশুরবাড়ি যাবি?

৫১৫

বড়ো বউ গো রান্না চড়া
ছোটো বউ গো জলকে যা।
জলের ভিতর লেখাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা।
ফুলে বড়ো কুঁড়ি
নটের শাকে বড়ি॥

৫১৬

বল্ দেখিনি গাড়ি?　　গাড়ি।
তোর সঙ্গে আড়ি।
বল্ দেখিনি ডাব?　　ডাব।
তোর সঙ্গে ভাব॥

৫১৭

বাঁকা হাতের নাচন
　　পায়ের নাচন
চাঁদা মুখের নাচন
নাটা চক্ষের নাচন
কাঁটালি ভুরুর নাচন
বাঁশরি নাকের নাচন
মাজা বেঙ্কুর নাচন

আর নাচন কী
অনেক সাধন করে
যাদু পেয়েছি॥

৫১৮

বাঁশপাতাটি নড়ে চড়ে
ননির বর গয়না গড়ে।
ননিকে দেখতে মজা
ও গ্যাঁদাফুল বাজনা বাজা॥

৫১৯

বাঁশবনের কাছে
ভুঁড়োশিয়ালি নাচে।
তার গোঁফজোড়াটি পাকা
তার মাথায় কনকচাঁপা॥

৫২০

বাগ্‌বাজারের নবীন দাস
রসগোল্লার কলম্বাস॥

৫২১

বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমির এল ছুটে।
কুমিরের ভয়ে গেলাম ঘর
দাসী মাথা কুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম সরে
ননদ মন্দ বলে।
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শাশুড়ি উঠে জ্বলে।

রাগ কর না শাউড়ি গো
আমি তোমার মেয়ে।
তুমি যদি খেদাও তবে
দাঁড়াই কোথায় যেয়ে

৫২২

বাঘের মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় দো-পায়া কুকুর।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে তির কাম্‌টা ফেক্কে মেরেছে॥

৫২৩

বাছা গিয়েছে উতর পাড়া
ভাত হইছে যে কর্‌করা
ব্যঞ্জন হইছে বাসি।
বাছারে ডাকিয়া আন
দিনান্তের উপাসি॥

৫২৪

বাছার বাছা পো
নিমতলাতে শো।
নিম পড়ল বুকে
হাজরা এল নিতে
বাপ দেয় না যেতে।
বাপের হাঁসা ঘোড়া
মায়ের ছাপন দোলা
বোনের স্থাপন পেটারি
ভায়ের সোনার ধড়া।
বাপ যাবেন গৌড়
আনবে সোনার ময়ূর
দেবে সোনার বিয়ে।
আল্‌পনাতে চাল নেই
নাচব ধেয়ে ধেয়ে॥

৫২৫

বাড়া ভাত গুছন-গাছন।
ছেলেটার চিঙ্‌ড়ে নাচন চিঙ্‌ড়ে নাচন

৫২৬

বাদুড় বাদুড় কলা তিতা
তোর শাশুড়ি আমার মিতা।

অলি গলি বাদুড়ের ছাও
তোমার মা ঘরে নাই শুয়ে নিদ্রা যাও।
খোকার বাপ গেছে হাটে
মা গেছে ঘাটে।
খোকাদের হাঁড়িকুড়ি বেড়ালে চাটে॥

৫২৭

বাপ দিলেন শাঁখা শাড়ি মা দিলেন ঝারি।
ঝপ্ করে মা বিদেয় কর রথ এসেছে ভারি।
এ রথে যাব না মাগো ফিরতি রথে যাব।
সিকি পয়সার পান কিনে ননদ-ভাজে খাব॥

৫২৮

বাপ ধন ধন ধনা।
পুঁথি হাতে পড়বে মানিক
দুলবে কানে সোনা।
আমার বাপ ধন ধন ধনা॥

৫২৯

বাপধন শ্বশুরের নাতি
এতকাল ছিলে কতি?
হরিদ্রার বনে
মায়ের বিকলি শুনে
এলেম বনে বনে॥

৫৩০

বাপ নয় তো কে
তপ্ত দুধে মর্তমান
চিনি ছড়িয়ে দে।

বাপ নয় তো খুড়ো
কী খেতে সাধ হয়েছে
রুই মাছের মুড়ো।
বাপ নয় তো শ্বশুর
তপ্ত জলে পা ধুয়ে
ভোজন করতে বসুক॥

৫৩১

বাপের ঘরের ঝি
আদর করব না তো কি!
আদরের পাত্‌না পেতেছি
আদর করব না তো কি॥

৫৩২

বাবা করেছিল চৌকিদারি
মুখে রেখেছিল মোচ।
সেই গরবে গরবিনী
হাতে ধরেছি পোঁচ॥

৫৩৩

বুক জুড়ানো ধন আমার পদ্মলোচন
কেঁদো না রে সোনার জাদু থামো কিছুক্ষণ।
দুধ হয়েছে বলক্ তোলা মিছরি আছে হাটে
খাবে আমার সোনার যাদু যত পেটে আঁটে॥

৫৩৪

বুড়ি তোর কয়টি ছানা?
তিনটি ছানা।

কোন্‌টি কানা?
ছোটোটি কানা।
সেইটি দে না?
তা হবে না॥

৫৩৫

বুড়ি লো বুড়ি, দা খানা কই?
ছুতারে নিয়েছে।
ছুতার কই? পিঁড়ি চাঁছে।
পিঁড়ি কই? বউ বসেছে।
বউ কই? জলে গেছে।
জল কই? ডাউক খেয়েছে।
ডাউক কই? বনে গেছে।
বন কই? পুড়ে গেছে।
ছাঁই-পাঁশ কই? ধোপা নিয়েছে।
ধোপা কই? কাপড় কাচে।
কাপড় কই? রাজা পরেছে।
রাজা কই? সভায় গেছে।
সভা কই? ভেঙে গেছে॥

৫৩৬

বুড়ো খাটের খুরো
খাট নড়্‌ নড়্‌ করে।
বুড়োর মাথায় শালিক নাচে
আর কি বুড়োর বয়স আছে॥

৫৩৭

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
এক কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ি যান॥

৫৩৮

বৈরাগী ঠাকুর টং টং
কাউট্টা খাইতে বড় রং।
ছলার ভিতর মালা থুইয়া
বৈরাগী নাচে উবুত্ হইয়া॥

৫৩৯

ব্যাং ডাকে ক্যাঁ কোঁ
পাখি ওড়ে ভোঁ।
বুড়ো শালিক তাড়া করে
জোয়ান জোয়ান রোঁ।
তাই দেখে শূকর বেটা
করে ভীষণ গোঁ॥

৫৪০

ব্যাং বলে, চ্যাং ভাই
গর্তে ছিলাম ভালো।
চুনিলাল বেরিয়ে আমার
গা করলে কালো।
দেয়াল পড়ে ঝুরঝুরিয়ে
মাটি পড়ে খসে।
সাতশ ব্যাঙে কীর্তন করে
দেখে চুনিলাল বসে॥

৫৪১

বিড়াল। ভাবনা চিন্তা কর কি?
পিঁড়িতে বসেছি, ঠাকুরঝি।
কুকুর। ছেঁচো কুটো মুড়ো মাথা,
তবু না ছাড় বড়ায়ের কথা।
(পরের দিন কয়েকটা ছেলে বিড়ালের গলায়
দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।)
কুকুর। কাল যে বড় শুনিয়েছিলে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।
বিচুলির দড়ি গলায় দিয়ে এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?
বিড়াল। পাখি জুখি খাইনে এখন, ধর্মে দিছি মন।
তুলসির মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

৫৪২

ভরা হইতে শূন্য ভালো, যদি ভরিতে যায়।
আগে হইতে পাছে ভালো, যদি ডাকে মায়।
মরা হইতে তাজা ভালো, যদি মরিতে যায়।
বামে হইতে ডাইনে ভালো, যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হইতে খালি ভালো, মাথা তুলে চায়।
হাসা হইতে কাঁদা ভালো, যদি কাঁদে বাঁয়॥

৫৪৩

ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা॥

৫৪৪

ভ্যাংকাঁদুনে ফেউয়ার মা,
ঢাকা মুখে যাইও না
পাগের পিঠা খাইও না।
পাগের পিঠা খাইতে খাইতে
প্যাটে হইল ছা।
ছা বলে—'কা'॥

৫৪৫

ভিটের পরে শাক বুনলাম
শাক তর্‌তর্‌ করে।
শাক বেচে শাঁখা কিনলাম
সতিন জ্বলে মরে।
ওলো আলতা-কপালি
তুই আমায় ঝুম্‌কা দেখালি॥

৫৪৬

ভেবে চিন্তে দেখেছি সার
বেঁড়ে চুলে বাড় নেই আর।
যেটুকু তেল পাব
চুলের কপালে ছাই দিয়ে
মুড়িতে মেখে খাব॥

৫৪৭

ভোঁদড় শিয়ালি
বর্ষার চার মাস ভোঁদড় কোথায় ছিলি?
ভোঁদড় এলে এলে যায়
ভোঁদড় কাঁকড়া খুঁজে খায়।
বাড়ির বেগুন ডোবার মাছ
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচ॥

৫৪৮

মজুন্দার মজুন্দার তেল মাখোসে
তেলে ফুলে আগুন দিয়ে কনে দেখোসে।
কনের মাথায় নেইকো চুল, কানকাটা বর—
শাশুড়ি কনে বার কর॥

৫৪৯

মণি ঘুমায় ঘুমায়
বাঁশবনে ডাকে বাঘ দারুণ সময়।
ও ঘুমানি এস, আমার বাড়ি এস
আমার বাড়ি পিঁড়ি নেইকো
মণির চোখে বোসো॥

৫৫০

মণি নাচে থায় পায়
ঘুঙুর গেঁথে দেব পায়।
দিব্বি নাচন নেচেছে
দিব্বি ঢোলক বেজেছে।
কড়া পাঁচ ছয় কড়ি নিয়ে
মণির নাচন দেখ্‌সিয়ে॥

৫৫১

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কী
গামছা বান্ধা চিকন চূড়া ভাণ্ড ভরা ঘি॥

৫৫২

মণির সায় কান্দে গো মণিরে বিয়া দিয়া,
ঘর-শোভা মণি গো কেমন থাকবে গিয়া।

মণির মা মণিরে থুইয়া চাউল ভাজা খায়,
ঘর-শোভা পক্ষীডা মণিরে লইয়া যায়॥

৫৫৩

মন্দ বড়ো বাঘের বাছ
হেলান দিয়েছে আমরুল গাছ।
দুর্বার কোঁত্‌কা হাতে
চলেছে রাজপথে,
পথে দেখেছে পাকাটি
লেগেছে দাঁত কপাটি॥

৫৫৪

মশার জ্বালায় বাঁচি না লো
মশা ভন্‌ ভন্‌ করে।
মশার জ্বালায় গেলাম বনে
বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমির এল ছুটে।
কুমিরের ভয়ে গেলাম বাড়ি
দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে
ননদে মন্দ বলে।
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শাশুড়ি উঠে জ্বলে।
রাগ কোরো না শাশুড়ি গো
আমি তোমার মেয়ে।
তুমি যদি খেদাও তবে
দাঁড়াই কোথায় যেয়ে॥

৫৫৫

মশার লগে হাতির লড়াই
　　নাহি অব্যাহতি।
চিতা বাঘে তর্ক করে
　　বেজি খাইল লাথি॥

৫৫৬

মাগো মা ঝাউবনের হাউ এসেছে।
হাউ নয় হাউ নয় বুদ্ধি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফেক্‌কে মেরেছে
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেঁথেছে।
কারবাদের রসবতী জলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ি কোন্ পাড়া?
আমার বাড়ি মধ্য গাঁ
আসতে ডাহিন যাইতে বাঁ॥

৫৫৭

মাগো মা তোমার জামাই এসেছে
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে।
তেল মাখতে তেল দিইছি ফেলে দিয়েছে
আক্ কাটতে ছুরি দিইছি নাকটি কেটেছে।
পা ধুইতে জল দিইছি খেয়ে ফেলেছে
বসবে বলে পিঁড়ি দিইছি শুয়ে পড়েছে॥

৫৫৮

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুই গণ্ডা
বাকি রইল ষোলো।
তাহা ধুইতে আটটা জলে পালাইল।

তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আঁটি কাঠ।
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবেশীকে চারিটা দিতে হয়।
তবে থাকিল দুই
তার মধ্যে একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক
ওই পাত পানে চাহিয়া দেখ্।
এখন হইস্ যদি মানুষের পো
তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো।
আমি যেই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥

৫৫৯

মানিক মানিক মানিক
নাচো দাঁড়ায়ে খানিক
কেঁদো না রে নীলমণি—
কত সুন্দর কনে আসবে আপনি।
কাঁদলে গলা ভাঙবে
রাত পোয়ালে বাঁশি দেব—
যত সোনা লাগবে॥

৫৬০

মাথা নাড়ে—চুল নড়ে
কালো চুল—মুখে পড়ে।
মাথা নাড়ে—জট নড়ে
গাল বেয়ে—লাল পড়ে॥

৫৬১

মামাদের কোঠা বাড়ি
বকুল ফুলের ছড়াছড়ি।
হেই মামা তোর পায়ে পড়ি
বউটা দে না খেলা করি॥

৫৬২

মামাদের পুকুরেতে ফেলিলাম জাল
তাহাতে উঠিল এক রাঘব বোয়াল।
মাছ উঠেছে মাছ উঠেছে কুটবে কে?
ওই আসছে কুটুনি বঁটি হাতে করে।
কোটা হল ভালো হল ধোবে কে?
ওই আসছে ধুউনি খালুই হাতে করে।
ধোয়া হল ভালো হল রাঁধবে কে?
ওই আসছে রাঁধুনি কড়াই হাতে করে।
রাঁধা হল ভালো হল খাবে কে?
ওই আসছে খাউনি থালা হাতে করে।
খাওয়া হল ভালো হল পান দেবে কে?
ওই আসছে খোকনমণি পান হাতে করে॥

৫৬৩

মামা ভাইগ্‌না যেইখানে
আপদ নাই সেইখানে॥

৫৬৪

মামা মামি দোলে
অগ্রদ্বীপের কোলে।

মামি কাটে সরু সুতা
মামা কাটে পাট।
সত্যি করে বল্ গে মামি
মামা গেছে কোন্ হাট॥

৫৬৫

মামা শ্বশুর ভাগিনাবউ
মোরে না ছুঁইও কালা বউ।
কালা বউ দেখছ নি
তপ্ত অম্বল খাইছ নি॥

৫৬৬

মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের আগে টিয়া
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়া।
কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানলাম মা বড়ো ধন।
মাকে দেব শঙ্খ সিঁদুর ভাইকে দেব বিয়া
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া তীর্থ করি গিয়া॥

পাঠান্তর ঃ ১

মাসি পিসি বন কাপাসি বনের মধ্যে টিয়ে
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন
আজ হতে জানিলাম মা বড়ো ধন।
মাকে দেব শাঁখা শাড়ি ভাইকে টাকার তোড়া
বাপকে দেব জামা জোড়া আর নীলে ঘোড়া।
খাব তো ধোব তো নাচব থেয়ে থেয়ে
অলঙ্গেতে চাল নাই তবে কিসের বিয়ে॥

পাঠান্তর ঃ ২
(প্রথম চার পংক্তির পর)
মাকে দিলাম শাঁখা শাড়ি বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া
ভাই-এর দিলাম বিয়ে।
কলসিতে তেল নেইকো কিবা সাধের বিয়ে
কলসিতে তেল নেইকো নাচব থিয়ে থিয়ে॥

পাঠান্তর ঃ ৩
(প্রথম চার পংক্তির পর)
মা হয়ে জল দেন তৃষ্ণা ভরিয়ে
বাপ হয়ে গোরু দেন পাল ঢাকিয়ে॥

৫৬৭
মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।
কীসের মাসি কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানলাম মা বড়ো ধন।
মাকে দিলুম আমনদোলা
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া
আপনি যাব গৌড়
আনব সোনার মউর।
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে
আপনি নাচব থিয়ে॥
পাঠান্তর ঃ
(শেষ দুই পংক্তির পরিবর্তে)
দেব ভায়ের বিয়ে ফুলচন্দন দিয়ে
কলসিতে তেল নাইক নাচব থিয়ে থিয়ে।
একদিকে রে বেগুনভাজা একদিকে রে ঝোল
নাচ তো কলাবউ বাজিছে ঢোল॥

৫৬৮

মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলে নাকো খইনাড়ুটা ধর্।
মাসি বড় রসাল করে খুদ রেঁধেছে
বোনপো-কে দেখে মাসি জল ঢেলেছে॥

৫৬৯

মিথ্যেবাদী কলার কাঁদি
ছুঁচোর লেজ তোর গলায় বাঁধি॥

৫৭০

মিথ্যেবাদী কলার কাঁদি
বাগ্‌বাজারের দই।
সব বাঁদরে খেয়ে গেল
ধেড়ে বাঁদর কই॥

৫৭১

মেঘ খেয়ে রোদ হয়, তার বড়ো চড়্চড়ানি।
বউ হয়ে গিন্নি হয়, তার বড়ো ফড়্ফড়ানি॥

৫৭২

মেঘ গড়্গড়্ মেঘ গড়্গড়্
চিংড়ি মাছের ঝোল।
মামা গেছে পাত কাটতে
মামিকে নিল চোর॥

৫৭৩

মেঘরাজারে তুইনি সোদর ভাই
এক ঝুড়ি মেঘ দাও ভিজ্জ্যা ঘরে যাই।
ভিজ্জ্যা ঘরে যাইতে যাইতে মায় দিল না ঠাঁই
লাথি দিয়া ফালাইয়া দিল কচুখেতের পাই।
কচুখেতের পানি যেমন টল্‌মল্‌ করে
মার চোখের পানি ফুটি বুক ভাসিয়া পড়ে॥

৫৭৪

মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ
যেন ফুলের মধ্যে রাধাপদ্ম।
রঙটা কিছু চড়া চড়া
গন্ধ কিছু কড়া কড়া
পাপড়ি কিছু ছাড়া ছাড়া
যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ॥

৫৭৫

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা।
দেখ্‌ শত্তুর চেয়ে
আমার কত সাধের মেয়ে॥

৫৭৬

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
মেয়ের ভাতে করব ঘটা।
নথ ভেঙে গড়িয়ে দেব
মেয়ের কোমরপাটা॥

৫৭৭

মেয়ে মেয়ে মেয়ে
ধুস্ করলি খেয়ে।
হরি ভক্তি উড়ে গেল
মেয়ের পানে চেয়ে॥

৫৭৮

যখন বাঙ্গীর খেতে চষে
তখন শেয়াল্নি এসে বসে।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে!

যখন বাঙ্গীর পাতা
তখন শেয়াল্নির হল মাথাব্যথা।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে।

যখন বাঙ্গীর কুষি
তখন শেয়াল্নি মনে মনে বড়োই খুশি।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে।

যখন বাঙ্গীর জালি
তখন শেয়াল্নি বেড়ায় আলি আলি।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে।

যখন বাঙ্গীর ফুল
তখন শেয়াল্নি ঝেড়ে বাঁধে চুল।

ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে!

যখন বাঙ্গীর বাতি
তখন শেয়াল্‌নি ঘোরে দিন বাতি।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে!

যখন বাঙ্গী ফাটে
তখন শেয়াল্‌নি বসে চাটে।
ও শেয়ালা আয় রে
গা-খানি মোর কেমন কেমন করে!

৫৭৯

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা
হাত-ঝুম্‌ঝুম্ পা-ঝুম্‌ঝুম্ সীতারামের খেলা।
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট।
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কিয়ে
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে।
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা॥

৫৮০

যাক্ ধান থাকুক নাড়া
ধান তুলব বত্রিশ আড়া।
বত্রিশ আড়ায় ঘি কলসি
সরু চালের ভাত।
খোকা খাবে সাপুর সুপুর
বউ কুড়াবে পাত॥

৫৮১

যা চলে যা ড্যামরা-চোখো
পাবি নে আমার ছেলে
ও থাকবে আমার কোলে।
ওর কোমল গায়ে ব্যথা পাবে
বসতে মখমলে॥

৫৮২

যাদু ঘুমোরে ঘুমো।
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে দারুণ হুমো

৫৮৩

যাদু ধন পরাণের কাটি
তার গায়ে লাগে না মাটি।
যাদুর নূতন জামা গায়
তুর্কি জুতো পায়
যাদু বউ আনতে যায়॥

৫৮৪

যাদুর কাছে কে?
টিয়ে এসেছে।
যাদুর খাঁদা নাকটা নে
টিয়ে-নাকটি দে॥

৫৮৫

যাস্‌নে খোঁকা আঁধার ঘরে।
আঁধার-বুড়ি ধরবে তোরে॥

৫৮৬

যে খায় মুড়ো সে হয় বুড়ো।
যে খায় দাগা সে হয় কাকা।
যে খায় ল্যাজা সে হয় রাজা॥

৫৮৭

যে তক্তে রাজামশায় হয়েছিলেন ঘোড়া
সেই তক্তে মন্ত্রীমশায় হয়েছিলেন ভেড়া।
সেই তক্তে দেওয়ান মশায় বিছানায় দিলেন দেড়া
সেই তক্তে হাজিমশায় উগ্‌রে দিলেন চড়া॥

৫৮৮

যেন শুক আর শালিকে
চাকরে আর মালিকে।
ডোঙা আর শুলুকে
একটা গাঁ আর মুলুকে।
পাতালে আর গোলোকে
টমটমি আর ঢোলকে।
শাঁখে আর শামুকে
আফিমে আর তামুকে॥

৫৮৯

রঙ নয় যেন কাঁচা সোনা
মুখটি যেন চাঁদের কণা
নাসিকাটি তিল ফুল
দাঁতগুলি মুকুতার দুল
আঙুলগুলি চাঁপার কলি
নয়নে খেলে বিজলি
কেশে কালো মেঘ খেলে
সেই ধনটি আমার ছেলে॥

৫৯০

রথতলাতে এল বান
কুড়িয়ে পেলাম সোনার চান।
আর একবার যাব—
খুকুর মতো কালো কালো
আর গোটা দুই পাব॥

৫৯১

রাই রাই রাই
আমরা মুসুরি কলাই খাই।
ইন্দর কাকা, বড়ো দুঃখ পাই।
হাত ভাঙ্গল পা ভাঙ্গল
ভাঙ্গল মাথার খুলি।
আর কখন চাইপ্‌ব নারে
কাগবাজারের ডুলি।
কাগবাজারে বড়ো সুখ
কিলাই কিলাই ভাঙ্গব পাঁজরার বুক॥

৫৯২

রাত পোহাল মণি জাগিল
কোকিল করে রা।
দুধু খেয়ে যাদুমণি
পড়নেতে যা॥

৫৯৩

রাঁধুনে কাঁদুনে ওরে নাটাচোখের ঝি
কোণে বসে করো কী?
নাক কাটব চুল ছাঁটব করব গাঙের পার
খোকনমণি রেতে দিনে কাঁদেন একটি বার॥

৫৯৪

রানু কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট
কিনে আনব শুকনো কাঠ।
তোমার কান্না কেন শুনি
তোমার সিকেয় তোলা ননি।
তুমি খাও না সারাদিনই॥

৫৯৫

রূপ ছিল গো মোরা
রূপ দেখেছ কি তোমরা
রূপে অঞ্জলি দিত
ঘর থেকে বেরুলে
কুকুর ভেকুইত।

চুল ছিল গো মোরা
চুল দেখেছ কি তোমরা
চুলে অঞ্জলি দিত
নাইতে নাইতে চুল
আপনি শুকাইত।
দাঁত ছিল গো মোরা
দাঁত দেখেছ কি তোমরা
দাঁতে অঞ্জলি দিত
ঘরে থেকে না বেরুতেই
মটকায় ঠেকিত॥

৫৯৬

রোদ আয়রে হেনে
ছাগল দেবে মেনে।
ছাগ্‌লির মা বুড়ি
কাট কুড়ুতে গেলি
ছ-খান কাপড় পেলি
ছ-বউকে দিলি।
আপনি মরিস্‌ জাড়ে
কলাগাছের আড়ে।
কলা পড়ে দুপ্‌দাপ্‌
বুড়ি খায় গুপ্‌গাপ্‌॥

৫৯৭

রোদ দে ঠাকুর চড়চড়া
ছাগল দেব মড়মড়া।
সেই ছাগলটি রাঙা
মামির মায়ের সাঙা॥

৫৯৮

লক্ষ্মীপিঁড়ে সরু চিঁড়ে
বাগবাজারের দই
শান বাঁধানো ঘাট পাই তো
মনের কথা কই॥

৫৯৯

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে।
মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে॥

৬০০

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই॥

৬০১

লেখা পড়া যেমন তেমন
জামা জোড়া কেমন?
শিমুলে ফুটেছে ফুল
লাল পারা যেমন॥

৬০২

শাউড়ি বাউড়ি ঝগড়া করে
দুয়ারে মারে কাঁটা
শাউড়ি কিছু বলতে গেলে
বাউড়ি ধরে ঝাঁটা।
অধরাকে ধরতে পারে
সেই তো বাপের বেটা।

আমের গাছে জামের পাতা
লতায় পাতায় পিঠা।
চার রকমের ফুল ফুটেছে
পাঁচ রকমের মিঠা॥

৬০৩

শাক শাক আঠারো শাক
তারপর এল ঢেঁকি শাক।
ঢেঁকি শাক লাগে না মন্দ
তারপর এল ভাঁড়ালি ছন্দ।
ভাঁড়ালি ছন্দের মাথায় গাড়ু
তারপর এল ক্ষীরের লাড়ু।
ক্ষীরের লাড়ু লাগল তিতা
তারপর এল আস্‌কে পিঠা।
আস্‌কে পিঠার বুকে খুদ
তারপর এল পোড়া দুধ।
পোড়া দুধ লাগে না ভালো
নেড়ার মাথায় ঘোল ঢালো॥

৬০৪

শাল বনে শাল পাঙ্‌ড়া
কদম গাছে কলি রে।
বধার গায়ে লাল গামছা
ছটক দেখে মরি রে॥

৬০৫

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে
আর নাচে ইন্দ্র

গোকুলে গোয়ালা নাচে
পাইয়ে গোবিন্দ।
ক্ষীর ক্ষীরসে ক্ষীরের নাড়ু
মর্তমানের কলা
নুটিয়ে নুটিয়ে খায়
যত গোপের বালা।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে
তাদের হাতে দড়ি কাঁধে ভাঁড়
নাচে থেয়ে থেয়ে।

৬০৬

শিল শিলাতি শিলাতি
শিল আছে ঘরে।
হর বলে, গৌরী কি ব্রত করে॥

৬০৭

শোলক মোলক বাঁশের গজা
ভাতটি খেয়ে পেটটি সোজা
পানটি খেলে আরো মজা॥

৬০৮

যষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম
সোনার চাঁদ।
আর বার চার যাব
আর গোটা চার পাব॥

৬০৯

ষষ্ঠী বাছা পাবের গোছা
তুলে নাড়া দে রে।
যে আবাগি দেখতে নারে
পাড়া ছেড়ে যা রে॥

৬১০

যোল কৈ যলুয়ে
দুটা গেল তার পালিয়ে।
তবুও তো থাকে চৌদ্দ
দুটা নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য।
তবুও তো থাকে বারো
হারিয়ে গেল দুটা আরো।
তবুও তো থাকে দশ
দুটা দিয়ে কিনেছি রস।
তবুও তো থাকে আট
দুটা দিয়ে কিনেছি কাঠ।
তবুও তো থাকে ছয়
ঘরে আছে মেনি বিড়াল
তার জন্যে দুটা রয়।
তবুও তো থাকে চার
জলে গেল দুটা তার।
তবুও তো থাকে দুই
ঘরে আছে রোগা ছেলে
তার জন্যে একটা থুই।
তবুও তো থাকে এক
চক্ষু চেয়ে পাতের দিকে চেয়ে দেখ।
আমি ভালো মানুষের ঝি
তাই একে একে হিসাব দি।

তুই যদি হস্ ভালো মানুষের পো
তবে কাঁটাখান্ খেয়ে মাছখান্
আমার জন্যে থো॥

পাঠান্তর ঃ
যোল কৈ যোলয়ে
চার কৈ গেল পালিয়ে।
থাকে বারো।
পাড়া পড়শিকে দুইটা দিতে পার।
ঠেকল দশে।
ধুতে বাছতে দু-টা খসে।
থাকে আট।
দু-টা দিয়ে কিনেছি কাট।
থাকে ছয়।
গুণধর ভাগ্নে দুটো খায়।
থাকে চার।
দুটো দিয়ে শুধেছি ধার।
থাকে দুই।
নিজের জন্য একটা থুই।
থাক্‌ল এক।
চোখ থাকলে পাতে চেয়ে দেখ॥

৬১১
সদাগরের মামাবাড়ি
কাঁসাই নদীর তীরে।
সদাগর গেল তার মামার বাড়ি
বসতে দিল পিঁড়ে।
জলখাবার দিল তারে
শালিক ধানের চিড়ে।

শালিক ধানের চিঁড়ে নয়
বিন্নি ধানের খই।
তার সঙ্গে আরো আছে
কাগমারির দই॥

৬১২

সন্ধ্যামণি সোনার তারা
সন্ধ্যামণি জলের ঝারা।
সন্ধ্যামণির পুজো করে কে?
সাত ভায়ের বোন হয় যে,
আলো ধানের কালো পুতে—
জন্ম জন্ম যেন যায় এয়োতে॥

৬১৩

সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা
জুজুমানা এসে আছে, সঙ্গে দু-পণ মশা।
আসিস্ না রে জুজুমানা, গোপাল ঘুমিয়েছে
হুম্-হুম্-হুম্ গুম্-গুম্-গুম্ ডালে বসেছে।
হাতে ছোরাছুরি আছে গোপালের আমার
আসিস্ যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার।

৬১৪

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে
খোকনকে যে খোঁড়ে, তার মুখটি পোড়ে।
আর যে খোঁড়ে মনে মনে
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে॥

পাঠান্তর ঃ

সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে
সোনামণির ঘরে
ঘর ঝক্‌মক্‌ করে।
সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে
খোকনকে যে খোঁড়ে,
মুখটা তার পোড়ে।
গাল পাড়ে মনে মনে
পুড়ে মরে সে আঁধার কোণে।

৬১৫

সাইর নাচে শালিক নাচে
মাদার পুষ্প খাইয়া।
দুধের ছাওয়াল নাচে
মায়ের কোল পাইয়া॥

৬১৬

সাত ভাই চম্পা জাগো রে।
কেন বোন পারুল ডাকো রে?
এসেছে রাজার মালি
দিবে কি না দিবে ফুল?
না দিব না দিব ফুল
উঠিব শতেক দূর
আগে আসুক রাজা তবে দিব ফুল

৬১৭

সাধ করে পালিলুম পাখি
নামে হীরামন
পিঁজরাতে থাকি রে পাখি
ডাকে ঘনে ঘন॥

৬১৮

সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস
বাঘ মেরেছি গোটা পঞ্চাশ।
আরো পাই তো আরো মারি
কেঁদো বাঘের তালাস করি॥

৬১৯

সূয্যি ঠাকুর রোদ করো
কলা বনে ঘর করো।
কলা হল বাতি
সূয্যির মাথায় ছাতি॥

৬২০

সূয্যিমামা সূয্যিমামা
রোদ করো না।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে
বেগুন কুটো না।
বেগুন হল চাকা চাকা
বউ হল খাঁদা নাকা।
বড়ো মরায়ে হাত দিয়ে
ছোটো মরায়ে পা দিয়ে
আয় সূয্যি ঝলমলিয়ে॥

৬২১

সেই মামা সেই মামি
সেই পুকুর পাড়ে ঘর।
এখন কেন মামি তোমার
দুধে পড়ল সর॥

৬২২

সোনা নাচে কোনা
বলদ বাজায় ঢোল।
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিশ মাছের ঝোল॥

৬২৩

সোনা নাকি ঝি আমার
      যাবে পরের ঘর।
ঘুঁটে-কুড়োনির ঝি এল
      খাবে দুধের সর॥

৬২৪

সোনামণি সোনা
আদা দিয়ে মুগের ডাল
ঘন দুধের ছানা।
চাঁদবদনী চাঁদের কণা
সবাই বলে—দে না, দে না
দিলে যে আমার ঘর চলে না
সেই কথাটি কেউ বোঝে না॥

৬২৫

সোনার আচির সোনার পাচির
সোনার তিনপাট দেয়াল।
তার উপরে বসে আছেন
জয় জগন্নাথ শেয়াল॥

৬২৬

সোনার নূপুর পায়
খুকু নেচে নেচে যায়,
হাতে নিয়ে সবরি কলা
চুষে চুষে খায়।
খুকু ফিরে ফিরে চায়
আর নাচে ধায় ধায়।
আয়রে কোলে আয়॥

৬২৭

সোনার যাদু রায়
দধি দুগ্ধ খায়।
তক্তাপোষে বসে যাদু
ডুগ্‌ডুগি বাজায়॥

৬২৮

সোল ডিগ্ ডিগ্ লতা পাতা
মারব ডিগ্ ডিগ্ যাবি কোথা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা॥

৬২৯

হড়ম্ বিবির খড়ম্ পায়
লাল বিবির জুতো পায়
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই্
ঢাকা গিয়ে ফল খাই্
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকায়েরা ঢাক বাজায়
খালে আর বিলে

সুন্দরীর বিয়ে দিলাম
ডাকাতের মেলে।
আগে যদি জানিতাম
ডুলি ধরে কাঁদিতাম॥

৬৩০

হরি আছেন কোন্‌খানে
পদ্মডাঙার বনখানে।
সেখানে হরি কী করে
কাদা গিঁজে গিঁজে মাছ ধরে।
তবে কী তোদের মাছধরা
হরি খেতে চান মণ্ডা মনোহরা।

৬৩১

হলদি কোটা মরিচ কোটা
জোড় পুতুলের বিয়ে।
ওই আসছে নতুন জামাই
গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা ভালো নয়
মেয়ে বিয়ে দেব না।
মেয়ে দেব সাজিয়ে
টাকা নেব বাজিয়ে॥

৬৩২

হাঁটি হাঁটি পা পা
যাদু হাঁটে রাঙা পা।
হাঁটি হাঁটি পা পা
খোকা হাঁটে দেখে যা॥

৬৩৩

হাঁড়ি ঢুক্ ঢুক্ করে ইঁদুর
খায় কলসির ধান,
লেজুড় গুটিয়ে থাকে কেমন
উঁচু দুটি কান।
বউয়ের জন্য ভোগ রেখেছি
ঢাকনি কেটে খায়,
পুরনো পিপুলের মতো
বীজ রেখে যায়॥

৬৩৪

হাট চলতে বাট বন্দী
বাট চলতে ঘাট।
স্বর্গ রাজা ইন্দর বন্দী
পাতালে বাসুকির পাট।
বাণ কথায় শিকল তোড়ি
মাছ মারি ট্যাংরা
গাছ মারি গাছ ফুটে
তাল মারি তাল ড্যাংরা।
তাল খেয়ে বন করলে সার
লাগ্ লাগ্ বন্দী কামাখ্যার॥

৬৩৫

হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্॥

৬৩৬

হাটের ঘুম মাঠের ঘুম
গড়াগড়ি যায়।
চার কড়া দিয়ে কিনলুম ঘুম
খোকার চোখে আয়॥

৬৩৭

হাত ঘুরুলে নাড়ু দেব
নইলে নাড়ু কোথায় পাব
সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেব
পড়ে গেলে কুড়িয়ে দেব॥

৬৩৮

হাত ফুল ফুল গা ফুল ফুল
আঘাত দেয় না ফুঁক।
পরের হাতের ভাত খেয়ে
চাঁদ হেন যে মুখ॥

৬৩৯

হাতির উপর আসে যায়
হাম্বা দেখ ভয় পায়
ফুলের ঘায় মূর্ছা যায়॥

৬৪০

হাতে কালি মুখে কালি
বাছা আমার লিখে এলি॥

৬৪১

হাতে চন্দ্র পায়ে চন্দ্র চাঁদ কপালে জ্বলে
তুমি আমার কত চাঁদ, চাঁদের মালা গলে।
আকাশে পাতিয়ে ফাঁদ
পেড়ে দাও গগনের চাঁদ॥

৬৪২

হাতের নাচন পায়ের নাচন
বাটা মুখের নাচন
নাটা চক্ষের নাচন
কাঁটালি ভুরুর নাচন
টিয়ে নাকের নাচন
মাজা বেঙ্কুর নাচন
আর নাচন কী?
অনেক সাধন করে যাদু পেয়েছি।

৬৪৩

হায়, করলাম কি!
জামাইকে দিলাম ঝি।
হারালাম লো—
বউকে দিলাম পো॥

৬৪৪

হায় রে মনা হায়
আর কি যাবি রে মনা
শ্যাম ঠাকুরের নায়?
শ্যাম ঠাকুরের নায়ে যেয়ে
কত কষ্ট পেলি।
গড়াতে গড়াতে মনা
জলে পড়ে গেলি॥

৬৪৫

হ্যা দেখ্ লো কলমিলতা
জল শুকুলে থাকবি কোথা?
জল শুকুলে থাকব বনে।

বনে যে বাগ্‌দি ম'ল
চিঁড়ে দই খেতে হল।
দেয় না রাজা পথ-খরচা
বাঁধব তোর ঘর-দরজা।
আসবে বাবু ভেয়ে
দেখবে চেয়ে চেয়ে
আর পড়বে আছাড় খেয়ে॥

৬৪৬

হ্যাদে লো কলমিলতা
এত কাল ছিলি কোথা?
এত কাল ছিলুম বনে।
বনেতে বাগ্‌দি ম'ল
আমারে যেতে হল।
তুমি নেও কলসি কাঁকে
আমি নিই বন্দু হাতে
চল যাই রাজপথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক্ নাচে॥

৬৪৭

হাসি হাসব না তো কি
চম্পাই নগরে হাসির বায়না দিয়েছি।
হাসি ষোলটাকা মণ
হাসি মাঝারি রকম।
হাসি বিবিয়ানা জানে
হাসি গুড়ুক্ তামাক টানে।
হাসি পয়রা গুড়ের সেরা
হাসি হুজুর করে জেরা॥

৬৪৮

হুম্ হুমুনি দুপ্ দুপুনি
রূপের হল রাই।
আপন খুশিতে আপনি ভাসে
কেউ কোথাকে নাই॥

৬৪৯

হেলেঞ্চা কলমি লক্ লক্ করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারেন পক্ষী শুকোয় বিল
সোনার কৌটা রুপার খিল।
খিল খুলতে লাগল ছড়
আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ ডাক পাড়ে—
রাজার মাথায় টনক নড়ে॥

৬৫০

হৈ রে বাবুই হৈ
রাঙা ধানের খৈ।
খোকামণির বিয়ে দেব
পয়সা কড়ি কৈ?
ফলার হবে সরা সরা
খৈ আর দৈ।
সারারাত খুঁজে মলাম
গুড় হাঁড়িটে কৈ॥

সংযোজন
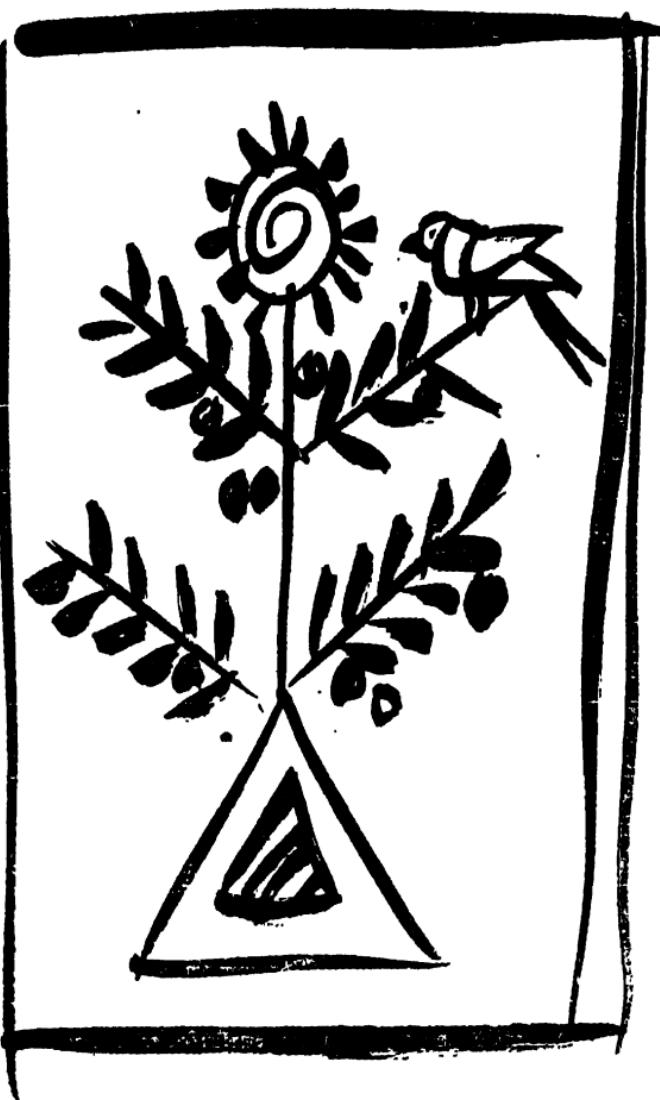
ছেলেভুলানো ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভালো লাগে বা না লাগে, সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এরূপ অহমিকা অহংকার নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত। যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে; তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেইসঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন; যে-কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায়, নিঃসংকোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু অক্ষমতা এবং অনভিজ্ঞতা-বশত সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই, সমালোচনস্থলে তাঁহাদিগকে একমাত্র নিজের অনুরাগ-বিরাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্যসম্বন্ধে বেদবাক্য প্রচলিত করিতে যাওয়াই স্পর্ধার কথা। কোন্ লেখা ভালো অথবা মন্দ, তাহা প্রচার না করিয়া 'কোন লেখা আমার ভালো লাগে বা মন্দ লাগে' সেই কথা স্বীকার করাই তাঁহাদের উচিত।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সে কথা কে শুনিতে চায়, আমি উত্তর করিব, সাহিত্যে সেই কথা সকল মানুষ শুনিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের সমালোচনাকেই সমালোচনা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমালোচনামাত্র। প্রকৃতি সম্বন্ধে, মনুষ্য সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে, কবি যখন নিজের আনন্দ বিষাদ বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিজের সেই মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা ও রচনাকৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন তাঁহাকে কেহ অপরাধী করে না। তখন পাঠকও অহমিকা সহকারে কেবল এইটুকু দেখেন যে 'কবির কথা আমার মনের সহিত মিলিতেছে কি না'।

কাব্যসমালোচকও যদি যুক্তিতর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক ছাড়িয়া দিয়া কাব্যপাঠজাত মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন, তবে সেজন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।

বিশেষত আজ আমি যে কথা স্বীকার করিতে বসিয়াছি, তাহার মধ্যে আত্মকথার কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি বর্তমান লেখকের নাই। এ কথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম—প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই-সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল, এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য ; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে, এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ-সকল—সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের

নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহারজগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থ-সকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই-সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই-সমস্ত রেণুজাল উড়িয়া যায়, এই-সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন-নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর-পরিচরে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখো, আকাশে পাখির ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটোবড়ো কত সহস্রপ্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে—এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে। অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না, এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না শোনেও না। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পুরাণে পাঠ করা যায়, পুরাকালে কোনো কোনো মহাত্মা ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছাবধিরতার শক্তি আছে এবং এই শক্তি তাহাকে প্রতিপদে ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি-অনুসারে গঠিত করিয়া লয়, তাহাই সে উপলব্ধি করে ; চতুর্দিকে, এমন কি মানসপ্রদেশেও, যাহা ঘটিতেছে, যাহা উঠিতেছে, তাহার সে ভালোরূপ খোঁজ রাখে না।

সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়তপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই

বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই-একটি ছড়া উদ্‌ধৃত করিবার পূর্বে পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমত, এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে। পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে, সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব! ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যে সেই মোহমন্ত্রটি আছে।

দ্বিতীয়ত, আটঘাট-বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই-সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে ॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুম্-ঝুম্ পা-ঝুম্-ঝুম্ সীতারামের খেলা ॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে ॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট ॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্কুর বেলা ॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই, সে কথা নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটা এই দেখা যাইতেছে, কোনোপ্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনোপ্রকার পরিচয়-প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ অন্বেষণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন-কি, মাঝে মাঝে

লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া, কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে—দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত, তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে তাঁহার শুভবিবাহ, সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে, সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত। যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনোপ্রকার উদ্‌যোগ অথবা সেজন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাটাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল, তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজিফুল যে কী ফুল, আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে, যমুনাবতী-নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে লোক লইয়া গেছে তাহার কোনোরূপ উদ্দেশ্য না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল-সংগ্রহ-দ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন, তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।

এই তো কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত, তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট বাঁধিতাম, যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটের অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিত, তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ ' । ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার

নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর-একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানসজগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাব-বশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক, সেখানে কর্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্রশক্তি-অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্যের সহিত বালকের লীলার সর্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যেই একটা ইচ্ছাময় আনন্দের সাদৃশ্য আছে।

পূর্বোদ্‌ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা, ত্রিপূর্ণির ঘাট, এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।

স্বপ্নের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কী আছে? না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রবল যুক্তিদ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ, কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্বাসজনকতা-নামক যে গুণটি সত্যের সর্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত, সেটা যেমন স্বপ্নের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে, প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অনেক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

বৃষ্টি বড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান ॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল, যখন এতাদৃশ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন-কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরানী মর্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে নাই। এই নির্বোধ তখনো বুঝিতে পারিত না, ঐ একটিমাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কী এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠজায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রয়াণ দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কস্মিন কালে কেহ ছিল, এক-একবার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়তো বা ছিল। হয়তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর-কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর-এক টুকরা থাকিতে পারে।

এ পার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর ॥
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে ॥
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সব্‌রি কলা, কাগ্‌মারে দই ॥

ভাবে-গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে, শিবুঠাকুর এবং শিবুসদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্য সম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ শখ আছে এবং বোধ করি আহার সম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাও নবপরিণীতের প্রথম প্রণয়যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে

শিবুসদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে 'শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই'। যেন ঘটনার সত্য সম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদর সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি কবির অধিক লক্ষ্য দেখা যাইতেছে, তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতেই পরমুহূর্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবুঠাকুরও কখন এমন করিয়া শিবুসদাগরে পরিণত হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষ-মধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য, বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্‌ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের এই স্বতন্ত্র দ্রুতগতিতে বালকের চিত্ত উপর্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে ॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে ॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে ॥
কে রেখেছে, কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে ॥
দাদা যাবে কোন্‌ খান দে, বুকলতলা দে ॥
বকুলফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মাল্লা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে, সীতেনাথের খেলা ॥

সীতেনাথ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।
সোনা-মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে ॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোঁটনবিশিষ্ট নোটন পায়রাগুলি, বড়ো সাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুই কাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্যসহকারে সীতানাথের খেলা এবং মধ্যাহ্নরৌদ্রে তপ্তবালুচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ-সমস্তই স্বপ্নের মতো। ও পারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে, তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন রচনা করা বড়ো কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজ ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেইখানেই ভাব আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন, সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের প্রথমোদ্‌ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায়, এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সেজন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করে না এবং কোনো সমালোচকও ভাববিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার-নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস বা আইন-কানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

ও পারে জন্তিগাছটি জন্তি বড়ো ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে ॥

প্রাণ করে হাইঢাই, গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ ॥
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিনলাম, চুন কিনলাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দেলাম ॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে বাড়ি ॥
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে ॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটা মোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে ॥
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে ॥
পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে ॥
টিয়ের মার বিয়ে
নাল গামছা দিয়ে ॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌর বেটী কনে ॥
নকা বেটা বর!
ঢ্যাম কুড়্ কুড়্ বাদ্দি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর ॥

এই-সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারাম-নামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপূর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল ; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চালকড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে—সীতারামও নহে, সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো-এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী জন্তিফল-ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসংগতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায়, অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য-দ্বারা সেটাকে

সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে ; অথচ এ ক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ; দুইয়ের বার। ঐ-যে ছড়ার এক জায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে, সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না।

দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে বাড়ি ॥

যেমনি সুবলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল, 'আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।' সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়তো শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে একটা কথা হইতে আর-একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্তকাল পূর্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না, মুহূর্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনা চেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদি বা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন 'নাল গামছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে' কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ, বিধবাবিবাহ টিয়েজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল গামছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই-সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। ইহার কারণ পূর্বে এক স্থলে বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে, আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মতো গড়িতে হয়—যেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে, তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত ; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে, তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছারচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই-সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে ; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন

সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিতচিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না।

চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।

এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।

ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্তধারার মতো তনুগাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে, তাহা ঐ এক ছত্রে এক মুহূর্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে—

পরনে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে।

সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আয় ঘুম, আয় ঘুম বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে ॥

ঐ শেষ ছত্রে জাল মুড়ি দিয়া বাগ্‌দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে, সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ঐ জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্‌দি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি, গুনতে গুনতে যাই ॥
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুরঝুর্ করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে, রক্ত ফুটে পড়ে ॥

দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গুনিতে গুনিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুরঝুর্ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে!

এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর-এক শ্রেণীর ছবি আছে, যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া

আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে সমস্ত-তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসংকোচে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও ॥
দাদার গলায় তুলসীমালা।
বউ বরনে চন্দ্রকলা ॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি ॥

দাদার বেতন অধিক নহে—কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের সচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি ॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে 'বউ বরনে চন্দ্রকলা'। যদিও ভগ্নীর খেলেনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য, তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কত দূর ॥
বর আসছে বাঘ্‌নাপাড়া।
বড়ো বউ গো রান্না চড়া ॥
ছোটো বউ লো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা ॥
ফুলের বরণ কড়ি।
নটে শাকের বড়ি ॥

জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে শেওড়াগাছের-বেড়া-দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথঘাট, বন, পুষ্করিণী, ঘটকক্ষ-বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্‌ধৃত করিতে আশঙ্কা করি, কারণ, ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত-গোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু

নাই ; কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারি দিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অদ্ভুত না হয়, তবে আর-একটা জিনিসই বা কেন অদ্ভুত হইবে? সে বলে, এক-মুণ্ড-ওয়ালা মানুষকে আমি কোনো প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ, সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ; দুই-মুণ্ড-ওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোনো বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিতে চাহি না, কারণ, আমি তো তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ; আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সমান সত্য, কারণ, সে তো আমার অনুভবের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম ; বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল, তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কী হে, দশ পা চলিয়া গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন ; তিনি বলিলেন, দশ পা চলা কিছুই আশ্চর্য নহে, উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য।

সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়, তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কী। বালক সেই প্রথম আশ্চর্যটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিতেছে—সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিস আছে, আরো অনেক জিনিস থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, এইজন্য ছড়ার দেশে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমানা-ঘটিত কোনো বিবাদ নাই।

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে ॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে ॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা ॥

প্রথমত, টিয়ে পাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই ; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই, কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁওয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপটাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরো বাড়িয়া উঠে। টিয়া বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্যস্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সংবরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য

ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই-সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ-সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধ করি সর্বত্রই দুর্লভ।

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে ॥
খোকা ব'লে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে ॥

ক্ষীরনদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সংকটেই পড়িয়াছিল, তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীরনদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে নদীতেই হউক, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট-গোছের কোলা ব্যাঙ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার বা সেই উড্ডীন চৌরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ—এ-সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূর্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ও পারটা ভালো দেখা যায় না। এ পারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন ; তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃশ্যটিও বেশ এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্র মাসের জলমগ্ন পক্বশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটির ; সেই কুটিরপ্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্নের অবসান-সূর্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন ; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটিরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে, সেও সুন্দর দৃশ্য—এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখিটি মা'র বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়াছে এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া

ফেলিয়াছে এবং নিমীলিতনেত্র মা দুই হস্তে সুকোমল ডানা-সুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন, সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোর্তিময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সেই-সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই ; প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনো সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্‌ধৃত করি—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি ॥

কবিসম্প্রদায় কবিত্বসৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র ছন্দে নারী-জাতির স্তবগান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উপরি-উদ্‌ধৃত স্তবগানেব মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে, এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া

যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুখানি সরল কৌতুক আছে। সীতার ধনুকভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিষ্টি আছে যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে ; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ বিচারে জয়, এ-সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না—উলটিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়ক-মহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল সেও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই তথাপি অনুমানে বলিতে পারি, লোকটি পুরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখন সে উত্তরগুলি জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মতো। কিন্তু সেজন্য নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন, 'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।' ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরো পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মতন আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্নজিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর কিছু নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটির রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম ; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ঈড়ন্‌গার্ডেনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলো, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটুখানি জমজমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক-রকম করিতে পারিতাম, কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি, যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ, সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন-কি, উহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত নীতি এবং সর্বজনদুর্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্মাণ করিতে পারি। কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা যদি কখনো আমাদের বর্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি, তবে কি তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি?

আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেব।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব॥
কালো গোরুর দুধ দেব।
দুধ খাবার বাটি দেব॥
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

এ কোন্ চাঁদ! নিতান্তই বাঙালির ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটিরের নিকটে বায়ু আন্দোলিত বাঁশবনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলি-বিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে ; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা, এতবড়ো লোকটা যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্যপাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কালো গোরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত? আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বউ-কথা-কওয়ের গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব জাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম—অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল, এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না, খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। এমন ঘোরতর বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধ নাস্তিকপ্রকৃতি তাহারা ছিল না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাংলাদেশের চাঁদামামা বাংলাদেশের সহস্র কুটির হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত ; হাঁ'ও বলিত না, না'ও বলিত না ; এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্‌দিন, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময় অমনি পথের মধ্যে কৌতুকপ্রফুল্ল

পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়া ছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিহ্নরেখা-সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে, কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক-টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥

এ মাসটা থাক্ দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে ॥

হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে একটি শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না। চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহুপূর্বে উজ্জয়িনী-রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
... ... কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—

'গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'
'হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥'

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনাপরম্পরা কে বলিয়া দিবে? দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে! সেই ঘর, সেই খেলা, সেই বাপ-মা, সেই সুখশৈশব, সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি এক দণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! সেদিন কিছুতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতেছিল না—বিশেযত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত মেঘচ্ছায়াশ্যামল কূলে-কূলে-পরিপূর্ণ অগাধশীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনই হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি। ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন, এমন-কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন। ভাইয়ের প্রতি 'গুণবতী' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল। সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না, তাহার সেই একটি দিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত। হয়তো ভুলটি গুরুতর নহে ; হয়তো ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ভরসা করি, তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ-লঙ্ঘন-পূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন-কি, পত্নীশ্রেণীয় সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃ সম্বোধনে অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে

প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে ॥
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে ॥
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে ॥
মাসি কাঁদেন, মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে ॥
পিসি কাঁদেন, পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই-যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে ॥
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে ॥
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই-যে বোন—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্বব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারে বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম—

বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে ॥

মা অলংকার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসি ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন ; আশা করিয়াছিলাম, এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোনো প্রিয়কার্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে। মা-বাপের পূর্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি

দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সব চেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহবিবাদ এবং সমস্ত খেলাধূলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়নঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া, ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই-সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্‌ধৃত করিতেছি, তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে—

দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি ॥
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি ॥
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর ॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদসম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষতবেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল, কোমর বেঁধেছে ॥
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পালকি বহাতে ॥
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে ॥

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা

তখনো সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু, উড়কি ধানের মুড়কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়িকে যে কী উপায়ে ভুলাইতে হয়, কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ সেও একটা বিষম শেল। অথচ, অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙাচোরা, হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পর্‌ভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে ॥
আয়ী গো চিনতে পার?
গোটাদুই অন্ন বাড়ো ॥
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর ॥
পরের বেটা মারলে চড়।
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর ॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি ॥
মায়ে দিলে সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা 'চল্‌ শ্বশুরবাড়ি'।

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্‌যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ঘরের বধূশাসনের জন্য পুলিসের আইনের চেয়ে সেই গার্হস্থ্য আইন, কন্‌স্টেবলের হুস্বযষ্টির অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার হুড়কো-ঠেঙা ছিল ভালো। আজ আমরা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি হইতে ফিরাইবার জন্য আদালত করিতে শিখিয়াছি, কাল হয়তো মান ভাঙাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু হাল নিয়মেই হউক আর সাবেক নিয়মেই হউক, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা—এতবড়ো অস্বাভাবিক বর্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ-মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ্ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী ॥
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদনকড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি ॥
চোখ খাও গো বাপ-মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো ॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে!

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট, যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম, সেই মহামহিম খোকা খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত, আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্বপ্রথম। সে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্নরৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চিরপুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে, তাহার বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয় বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকুদেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে কখনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি ॥

ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি-অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখি। শত সহস্র বার প্রতিষেধ প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে। সে মনে মনে জানে আমি উড়িতে পারি, এইজন্যই সে লোহার শলাকাগুলোকে বারংবার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোনো আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর

বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে, সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসদ্‌ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালোবাসা জোর করিয়া বলে, তোমরা কি মনে কর আমি পারি না? তাহার এই অসংকোচ স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মতো প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়; আমরা বলি, তাও তো বটে, কেনই বা না পারিবে? যদি কোনো সংকীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎবদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে, খাইবে কী। সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়, 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি'। শুনিবামাত্র আমরা মনে করি, ঠিক সংগত উত্তরটি পাওয়া গেল। অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা অবিসংবাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়। ভিন্ন পদার্থের প্রভেদসীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্বেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন, দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের শামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—কোনো প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরমুহূর্তেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয়, তখন কোনো জ্যোতির্বিদ্‌ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বরপূর্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব।
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি ॥

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে, এ-সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি, অকাট্য এবং নূতন—ইহার কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ, তবে তো মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্য নহে। তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কী ছিল?

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায়, তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন

দেখিতেছে, এখনো সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কী হইতে পারে! তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে, সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, এ কথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালোবাসা এক দিকে যেমন প্রভেদসীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্যন্ত কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম নাকি খোকার চোখে আসিয়া থাকে, এইজন্য তাহার উপরে সর্বদাই ভালোবাসার সৃজনহস্ত পড়িয়া সেও কখন একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিনলেম ঘুম, মণির চোখে আয় রে ॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেইজন্য সেই হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চার কড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরির তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন থেনা। বট পাকুড়ের ফেনা ॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচ্‌না কিনে আন্‌ ॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন
নাটা চোখের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা-বেঙ্কুর নাচন—
আর নাচন কী।
অনেক সাধন ক'রে জাদু পেয়েছি ॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহৎকে তুচ্ছ এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। 'নাচ রে নাচ রে জাদু, নাচনখানি দেখি।' নাচনখানি! যেন জাদু হইতে তাহার নাচনখানিকে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মতো দেখা যায় ; যেন সেও একটি আদরের জিনিস। 'খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।' এ স্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ স্বতন্ত্র এবং স্নেহাস্পদ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এল বেড়িয়ে। দুধ দাও গো জুড়িয়ে ॥
দুধের বাটি তপ্ত। খোকা হলেন খ্যাপ্ত ॥
খোকা যাবেন নায়ে। লাল জুতুয়া পায়ে ॥

অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতিক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোটো-ঘুন্টি-দেওয়া অতিক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতোজোড়া, সেটা হইল 'জুতুয়া'। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।

সর্বশেষে, উপসংহারকালে আর-একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি, সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ-যে বলা হইয়াছে 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি', ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য, অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়—মনে হয়, সমস্ত সংসার, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। যোগীগণ যে অমৃতলালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি ॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশে মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায়, মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধ-সকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয় এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে, অতি অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মুখ করেছে কেন্ রে মাখনচোরা—
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব।

হঠাৎ, তেলিমাগীদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহা সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘ-বিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে— শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

১৩০১

—